আমার নাম বকুল

প্রফুল্ল রায়

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৫৯

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : তাপস সরকার

মুদ্রাকর : দিপালী নাহারায় : বাবা তারকনাথ প্রেস

১৪, নরেন সেন স্কোয়ার : কলিকাতা-৯

আমার নাম বকুল

অগ্রজপ্রতিম

শ্রীযুক্ত ভবানী মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনারা আমাকে চেনেন না। অথচ কি মজার ব্যাপার দেখুন, রোজই ঠেলাঠেলি করে আপনাদের সঙ্গে ভিড়ের বাসে উঠছি, রেস্তোরাঁয় চা খাচ্ছি, সিনেমা-টিনেমাও দেখছি। এ শহরে আজকাল হঠাৎ হঠাৎ ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে যায়। তেমন কিছু ঘটলে আট-দশ মাইল হেঁটে আপনাদের সঙ্গে আমাকেও বাড়ী ফিরতে হয়।

আপনারা যেখানে, আমিও ঠিক সেইখানেই। কলকাতা নামে সত্তর লক্ষ লোকের এই বিশাল শহর সব সময় বারুদ হয়ে আছে; যখন-তখন সে ফেটে পড়ে। আর সেই সময় ফুটন্ত দুধের মতো আপনাদের সঙ্গে আমিও টগবগ করি। যখন খবর কাগজে দেখি আরেকটা কারখানায় ক্লোজার হল কিংবা আরেকটা অফিস দিল্লীতে উঠে গেল, আপনাদের মতো আমারও বুকের ভেতরটা কাঁপতে থাকে। চোখের সামনে যেন দেখতে পাই, আরো কয়েক শো মানুষের ওপর মৃত্যুর ঠাণ্ডা হাত নেমে আসছে।

এত কাছাকাছি আছি তবু আপনারা হয়তো চোখ ফিরিয়ে আমার দিকে কোনদিন তাকান নি; কিংবা তাকালেও মনে করে রাখেন নি। মনে রাখবার মতো কী-ই বা আছে আমার।

কিন্তু আমার ইচ্ছা, আপনারা আমার দিকে একটু তাকান, আমার কথা একটু শুনুন। আমার নিজস্ব কিছু দুঃখ আছে, কিছু সমস্যা। সেগুলো ফাঁদের মতো চারদিক থেকে আমাকে আটকে রেখেছে। সেখান থেকে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারছি না। সাঁতার-না-জানা মানুষের মতো অথৈ জলে আমি ক্রমশ ডুবে যাচ্ছি। জানি বলবেন, এসব শুনে আপনাদের কী লাভ? ক্ষতিও তো কিছু নেই। মানুষ

অনিচ্ছায় কত কী-ই তো করে। যে মেয়েটা সব সময় অ।
সঙ্গে আছে তার একটা অনুরোধ না হয় রাখলেনই।

আমার নাম বকুল। নামটা আমার মায়ের দেওয়া। ফুলের নামে মা নাম রেখেছিল কেন? সে কি এই ভেবে, ফুলের গন্ধের মতো আমার সুঘ্রাণে চারদিক ভরে যাবে?

আমার মা নেই; সেই কোন্ ছেলেবেলায় তাঁকে হারিয়েছি; আমার বয়েস তখন পাঁচও হয় নি। মা'র কথা আমার মনে পড়ে না। অনেকক্ষণ ভাবলে লালপাড় একটা শাড়ি, মস্ত সিঁদুরের টিপ, পানপাতার মতো একটা মুখ আবছাভাবে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অবশ্য আমার বাক্সে মা'র একটা ফটো আছে: অনেককাল আগে পূর্ব বাঙলার এক মফঃস্বল শহরে তোলা হয়েছিল। ফটোটা এত বাজে যে ওটা থেকে মা'র চোখমুখ কেমন ছিল কিছুই বোঝা যায় না। ওই অকেজো ছবিটা আর আমি, এ ছাড়া পৃথিবীতে মা'র অন্য কোন স্মৃতিচিহ্ন নেই।

মা বেঁচে থাকলে বলতে পারত, তাঁর দেওয়া নামটা কতখানি সার্থক করতে পেরেছি। তবে আমাকে যারা চেনে তারা বলে আমি মেয়েটা নাকি খুব ধীর, নম্র, শান্ত। অন্যের জন্য স্যাক্রিফাইস করে করেই শেষ হয়ে যাচ্ছি।

যে যা-ই বলুক, নিজে কিন্তু জানি, আমি খুব দুর্বল। এবং ভীরুও। একটুতেই ভেঙ্গে পড়ি, একটুতেই উচ্ছ্বসিত হই। সুখ বা দুঃখ, যত তুচ্ছই হোক, ঢেউয়ের মাথায় মোচার খোলার মতো আমি দুলতে থাকি। বিজন বলে, 'ইচ্ছা করলে যে কেউ তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে।' কিন্তু বিজনের কথা এখন না, পরে।

আমি থাকি শহরতলী ছাড়িয়ে আরো কিছুটা দূরে—সারি সারি যে রিফিউজি কলোনিগুলো রাস্তার ধারে জড়াজড়ি করে রয়েছে তাদের গা ঘেঁসে একটা সৃষ্টিছাড়া চেহারার একতলা বাড়িতে। এসপ্ল্যানেড থেকে প্রাইভেট বাসে উঠলে সেখানে পৌঁছুতে ঝাড়া দেড়টা ঘণ্টা লেগে যায়; ভাড়া তিরিশ পয়সা। ওই বাড়িটায় আর যারা থাকে তারা

বাবা, আমার সৎ-মা, তিন সৎ-ভাই আর এক সৎ-বোন। নিজের কোন ভাইবোন নেই। সৎ-ভাইদের নাম হাবু, গনেশ আর বাচ্চু। একটা একটা পোশাকী নামও তাদের আছে; কিন্তু সেগুলো কাজে লাগে না। যাদুঘরে মৃতদেহের মতো স্কুল-কলেজের রেকর্ডে ঐ নামগুলো সাজানো আছে মাত্র। সৎ-বোনের নাম নীলিমা। বছর চারেক আগে তার বিয়ে হয়েছিল। হলে কি হবে, মাসে পনের কুড়ি দিন অন্তত সে আমাদের বাড়িতেই থাকে। নীলিমা একাই না, সঙ্গে তার স্বামীও। এদের কথাও এখন না, পরে।

আমি ডালহৌসি স্কোয়ারের একটা বড় মার্চেন্ট অফিসের টাইপিস্ট। আমার বয়েস এখন ঠিক তিরিশ। অতটা অবশ্য দেখায় না। আমার অফিসের বন্ধু কনক প্রায় রোজই গালে টুসকি মেরে বলে, 'বারো বছর আগে যেদিন চাকরি করতে এলি সেদিন তোকে যেমন দেখেছি আজও তা-ই আছিস—সেই রকম অষ্টাদশী। তোর বয়েস আর বাড়ল না বকুল। এটা কনকের বাড়াবাড়ি। অষ্টাদশী না আর কিছু। তবে পাঁচ ছ'বছর কমিয়ে যদি চব্বিশ পঁচিশ বলি কেউ অবিশ্বাস করবে না। আসল বয়েসটা বললেই বরং চোখ-টোখ কুঁচকে বলবে, 'ওল্ড লেডি হবার এত শখ কেন? তোমার সব কিছুই উল্টো। লোকে বয়েস কমায়, তুমি বাড়াও।'

আরেক জন আছে যে আঠারোতেও খুশি না, পারলে আরো দু বছর কমিয়ে দেয়। সে বিজন। আবার বিজনের কথা এসে গেল। কিন্তু না, এখন শুধু আমার কথা।

পোশাক-টোশাক আমার খুবই সাদামাটা। বেশি বঙচঙ কিংবা জবড়জং সাজগোজ ভাল লাগে না; চোখে যেন বিঁধতে থাকে। সাদা শাড়িতে সামান্য কিছু কাজ থাকবে, নয়তো ছোটখাটো দু-একটা ফুল-লতা-পাতার ছাপ—এটাই আমার সব চাইতে পছন্দ। সাদা না পেলে খুব হাল্কা মোলায়েম রঙের কাপড়ও চলতে পারে। একটু-আধটু যে না সাজি তা নয়। হাজার হোক, মেয়ে তো। চোখে সরু করে কাজল টানি; মুখে একটু আধটু পাউডার মাখি। কখনো-সখনো স্নো কি ক্রিম। খোঁপা-টোঁপা বাঁধি না; চুলগুলো এক বেণী করে পিঠে

ঝুলিয়ে দিই। গয়না বলতে কানে একজোড়া সোনার দুল, ড[illegible]াতের মধ্যমায় একটা আংটি, গলায় কড়ির মালা, বাঁ হাতে রিস্টওয়াচ। ব্যাস্। বন্ধুরা এই নিয়ে দারুণ ঠাট্টা-টাট্টা করে, 'যৌবনে যোগিনী হতে চাস বকুল?' আমি কিছু বলি না, শুধু হাসি।

সেই মানুষটি, যার নাম বিজন—বিজন সান্যাল—সে-ও মাঝে মধ্যে খেপে ওঠে, 'এত সুন্দর গলা তোমার, তাতে কিনা কড়ি ঝুলিয়ে রেখেছ! চল, আজই একটা সোনার হার কিনে দেব।' ঐ দেখুন, বার বার বিজন এসে যাচ্ছে। অথচ এই মুহূর্তে তার কথা আমি বলতে চাই না।

আমাকে দেখতে কেমন? এবার কিন্তু ভারি বিপদে ফেললেন। নিজের রূপলাবণ্যের বর্ণনা দেবার মতো অস্বস্তিকর ব্যাপার আর কিছু নেই। অন্তত আমার মতো মেয়ের পক্ষে। আমার ঘরে একটা বড় আয়না আছে; কখনো-সখনো ওটার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। কাচের ওপর যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাকে দেখে মুগ্ধ হবার দিন কবেই ফুরিয়ে গেছে; তবু এই তিরিশ বছরেও খুব একটা খারাপ লাগে না। ইচ্ছে হয়, অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। আমার মুখ লম্বাটে; অনেকটা ডিমের মতো। ঘন পালকে ঘেরা বড় বড় চোখ। পাতলা নাকটা সোজা কপাল থেকে নেমে এসেছে। ফুলদানির মতো গোল গলা আমার, মসৃণ ঘাড়। কণ্ঠার হাড় অনেকের মতো ফুটে বেরোয় নি। নিভাঁজ ত্বকে এখনও অনেকখানি সজীবতা আছে। গায়ের রঙ আশ্বিনের রোদের মতো। আর কেউ লক্ষ্য করুক বা না-ই করুক, আজকাল আমার মুখে ময়লার মতো কালচে ছোপ পড়ছে। ক্রিম বা পাউডার-টাউডার মাখলে ওটা চাপা পড়ে, কিন্তু আমি জানি এই ময়লাটা বয়েসের দাগ; খুব বেশিদিন ওটাকে ঢেকে রাখতে পারব না।

সে যা-ই হোক, ক'বছর আগেও রাস্তায় বেরুলে নানারকম মন্তব্য কানে আসত। চায়ের দোকান থেকে কেউ কেউ চেঁচিয়ে উঠত, 'মইরা যামু হালায়।' কেউ বা গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে গাইত, 'প্রাণসজনি, যাইস না রে তুই পরানে ঢেউ দিয়া—' ট্রাম-বাসে উঠলে আমার চারপাশে মৌচাকের মতো ভিড় জমে যেত। তখন আমি চোখ তুলে

কোনদিকে তাকাতে পারতাম না। কান-টান দিয়ে আগুন ছুটতে থাকত যেন। আজকাল এসব সহজ হয়ে গেছে। তবে এই তিরিশ বছর বয়েসেও টের পাই, রাস্তায় নামলে দু' ধারে গুঞ্জন ওঠে। খুব যে একটা খারাপ লাগে, তা নয়।

আমাকে নিয়ে সব ব্যাপারেই কনকের উচ্ছ্বাস। সে বলে, 'বিউটি কনটেস্টে একবার নাম দে বকুল। সিওর ফার্স্ট প্রাইজটা পেয়ে যাবি।' কনকের কথা আমার এক কান দিয়ে ঢুকে তক্ষুণি আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়।

বিজন অবশ্য কিছু বলে না ; শুধু পলকহীন তাকিয়ে থাকে। সেই কবে থেকে এইভাবে সে আমাকে দেখে আসছে। ওই দেখুন, বিজনের কথা আবার এসে গেল। নাঃ, ওকে এড়িয়ে যাব, সাধ্য কি। বিজনকে বাদ দিয়ে আমার কোন কথাই বুঝি হয় না। আমার জীবনের সঙ্গে কি আশ্চর্যভাবেই না জড়িয়ে গেছে সে। তাকে আলাদা করে নেবার আর উপায় নেই। আমার জীবনের যেদিকে দুঃখ যেদিকে সমস্যা তার ঠিক উল্টোদিকে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে বিজন।

এতক্ষণ আমার কথা শুনলেন। আমি মেয়েটা কেমন, তার মোটামুটি একটা ছবি কাঁচা হাতে হলেও আপনাদের কাছে হয়তো এঁকে দিতে পেরেছি।

যে তিরিশটা বছর পেছনে ফেলে এসেছি তার সবগুলো দিন প্রায় একই রকম। ম্যাড়মেড়ে, গতানুগতিক। মাঝে মাঝে এক-আধটা বড় ঢেউ যে আসে নি তা নয়। কিন্তু সে আর ক'টা ? আঙুল গুনেই বলে দেওয়া যায়।

ভেবেছিলাম জীবনটা একভাবেই কেটে যাবে। কিন্তু তা আর

হল কই ? সোজা রাস্তা ধরে চলতে চলতে আচমকা আজ আমি একটা বাঁকের মাথায় এসে দাঁড়িয়েছি। আজকের দিনটা আমার জীবনের একটা বিশেষ দিন।

আমার দিকে আপনারা তাকান। অন্য দিন বকুল নামে যে মেয়েটা কোনরকমে নাকেমুখে গুঁজে কাঁটায় কাঁটায় ন'টার সময় সাদামাটা পোশাকে ডালহৌসির বাস ধরে তাকে আজ আর চিনতে পারবেন না। আজ আমার দিকে তাকালে আপনাদের চমক লাগবে; চট করে চোখের পাতা ফেলতে পারবেন না।

আজ আমি অফিসে যাই নি; একদিনের ছুটি নিয়েছি।

. এখন দুপুর; একটা দেড়টাব মতো হবে। নিজের ঘরের দরজায় খিল লাগিয়ে মেঝেতে ক্রিম-পাউডারের কৌটো, কাজললতা, আয়না-চিরুনি ছড়িয়ে আমি সাজতে বসেছি।

আমার এই ঘরটার কথা একটু বলে নিই। মেঝেটা লাল সিমেণ্টের। দুটো দেয়ালে প্ল্যাস্টার আছে; আর দুটোর ইঁট বার করা। বাড়ি করতে করতে বাবার টাকা ফুরিয়ে গেল, তাই ও দুটো আব ঢাকা হয় নি। তবে চারটে দেয়ালেই চুনকাম করা হয়েছিল; তাও আজকাল না; বছর দশেক আগে। তারপর এ ঘরে আর হাত পড়ে নি। এখন জায়গায় জায়গায় চুন উঠে কাল্‌চে ছোপ ধবে গেছে; কোণে কোণে ঝুল।

এই ঘরেরই দক্ষিণের দেয়াল ঘেঁষে একটা তক্তাপোশ পাতা। তার তলায় রাজ্যের হাঁড়ি-কুড়ি, বাক্স-টাক্স। একধারে একটা সস্তা টেব্‌ল, দুটো চেয়ার। পশ্চিম দিকের দেয়ালে ফিল্মস্টারের ছবিওলা চড়া রঙের ক্যাটকেটে একটা ক্যালেণ্ডার। কোত্থেকে জুটিয়ে এনে বাচ্চু ওটা টাঙিয়ে রেখেছে।

এ ঘরে আমি একাই থাকি। তবে কেউ এলে মেঝেতে একটা বিছানা পড়ে; গণেশ তখন এখানেই শোয়।

আচ্ছা, এবার আমার দিকে আবার তাকান। যে মেয়ে সাজসজ্জায় বিমুখ, উগ্র রঙচঙে পোশাকে যার দারুণ বিতৃষ্ণা, সে আজ গাঁঢ়

কমলালেবু রঙের সিল্কের শাড়ি পরেছে। তার সঙ্গে রঙ মিলিয়ে একটা ব্লাউজ। আজ আর বিনুনি করে বেণী ঝোলাই নি ; উঁচু করে চমৎকার একখানা খোঁপা বেঁধেছি। চোখে কাজল তো টেনেছিই, কপালে চীনা সিঁদুরের একটা গোল টিপও পরেছি। যা কোনদিন করি না, ঠোঁট আর নখও আজ রাঙিয়ে নিয়েছি। রঙ-টঙ, তা যেমনই হোক, আজ খুব ভাল লাগছে। শুধু রঙই কি মেখেছি, চার গাছা কবে চুড়িও পরেছি হাতে ; কড়ির মালাটা বদলে গলায় দিয়েছি বড় লকেটওলা সোনার হার। আংটি আর দুল তো আছেই। আরো কিছু গয়না-টয়না থাকলে তাও আজ পরতাম ; কিন্তু এছাড়া আমার বলতে আর কিছুই নেই। আজ আমাকে দেখলে কনকরা আর 'যৌবনে যোগিনী' বলে ঠাট্টা করবে না।

সাজা-টাজা শেষ হলে কব্জি উল্টে হাত-ঘড়িটা দেখে নিলাম। দুটো বাজতে পাঁচ। ঠিক চারটের সময় নর্থ ক্যালকাটার একটা সরু গলির শেষ মাথায় সেই পুরনো দোতলা বাড়িটায় আমাকে পৌঁছুতেই হবে। সেখানে বিজন আর তার ক'টি বন্ধু আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

এখান থেকে নর্থ ক্যালকাটায় যেতে কম করে দেড় দু ঘণ্টা তো লাগবেই। তাই আর বসে থাকা যায় না।

বড় আয়নাটা হাতের কাছেই আছে। শেষ বারের মতো নিজেকে দেখে নিলাম। উজ্জ্বল কাচে যার ছায়া পড়ল তার মুখ কিছুটা বিষণ্ণ, চোখের তারা স্থির, ঠোঁটের কোণ অল্প অল্প নড়ছিল। আজকের দিনেও নিজেকে সাজিয়ে নিতে হবে, কে ভাবতে পেরেছিল। এমন একটা দিন সব মেয়ের জীবনেই আসে। তাদের নিয়ে তখন কি কাণ্ডই না শুরু হয়ে যায়! বন্ধুরা, সমবয়সিনীরা এসে তাদের সাজাতে বসে। হাসি-ঠাট্টা-আনন্দ আতসবাজির মতো ফস ফস জ্বলতে থাকে। কিন্তু আমাব বেলায় ?

এই দেখুন না, দরজায় খিল লাগিয়ে চোরের মতো আমাকে সাজাতে হল। আশেপাশে একটা বন্ধু নেই, কেউ হৈ-চৈ করছে না। এমন দিনটা এত চুপচাপ, এত ম্যাড়মেড়ে, এত নিরুৎসব হবে, ভাবি নি।

কয়েক পলক আয়নার দিকে তাকিয়ে থেকে একসময় উঠে পড়লাম। প্রসাধনের জিনিসগুলো টেবলে সাজিয়ে রেখে দরজা খুলে বেরুতে যাব, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। তক্ষুণি ফিরে এসে তক্তাপোশের তলা থেকে একটা বড় বাক্স টেনে এনে খুলে ফেললাম। তারপর জামা-কাপড় হাঁটকে হাঁটকে মা'র ফটোটা বার করলাম।

আগেই আপনাদের বলেছি, মা'র ফটোটা খুব বাজে। তার ওপর উই লেগে অনেকখানি নষ্ট হয়ে গেছে, বাকি যেটুকু আছে রঙ-টঙ জ্বলে হলুদ। মাকে চেনা যায় না, বোঝা যায় না, তবু তার দিকে তাকিয়েই আবছা আধফোটা গলায় বললাম, 'আমি যাচ্ছি মা, তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর।' আমার স্বর ক্রমশ জড়িয়ে এল। টের পাচ্ছি চোখ জলে ভরে যাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি মা'র ফটোটা বাক্সে রেখে ডালা বন্ধ করে ফেললাম। তারপর বাক্সটা তক্তাপোশের তলায় ঠেলে দিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

আমাদের বাড়িটার ছিরি-ছাঁদ নেই। একটানা তিনখানা ঘর—পুব থেকে পশ্চিমে চলে গেছে। ঘর থেকে বেরুলেই লম্বা বারান্দা। বারান্দাটা মাটির, রোদ বৃষ্টি ঠেকাবার জন্য বাঁশের খুঁটি পুঁতে টালির শেড লাগানো হয়েছে। বারান্দার পুবদিকের খানিকটা অংশ আবার দরমা দিয়ে ঘেরা। ছাদে টিনের একটা চালা। ইট-কাঠ-বাঁশ-টিন-দরমা—এ বাড়িতে ইচ্ছামতো ব্যবহার করা হয়েছে।

বাইরের দেয়ালগুলোতে প্ল্যাস্টার বলতে কিছু নেই। বর্ষার পর বর্ষা শ্যাওলা জমে জমে সারা বাড়িটায় স্থায়ী কাল্‌চে দাগ ধরেছে। এখানে ওখানে ইটের ফাঁকে ফাঁকে অশ্বত্থ আর নানা জাতের বুনো গাছের চারা মুখ বাড়িয়ে আছে। বাড়িটার আয়ু খুব বেশিদিন নেই।

এই দুপুর বেলায় বাড়িটা নিঝুম। হাবু, বাচ্চু বা গণেশ, কেউ এ সময় থাকে না। সারাদিনে কতক্ষণই বা থাকে! খাওয়া আর শোওয়া ছাড়া এ বাড়ির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই। বাবা এখন অফিসে। নীলিমা ক'দিন ধরে শ্বশুর বাড়িতেই আছে। এ সময় থাকার মধ্যে

শুধু মা। সৎ-মাকে মা বলাই তো নিয়ম।

ডান দিকে দু পা এগুলেই মা-বাবার ঘর। দরজাটা হাট করে খোলা রয়েছে। বাইরে থেকেই চোখ পড়ল, মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে মা ঘুমোচ্ছে। ভালই হয়েছে। জেগে থাকলে আমার এত সাজসজ্জা দেখে মা'র চোখের তারা নিশ্চয়ই কপালে উঠে যেত। হাজার রকম কৈফিয়ৎ দিতে দিতে ঘেমে উঠতাম। আস্তে করে ডাকলাম, 'মা—'

সাড়া নেই। ঘুমটা গাঢ়ই মনে হচ্ছে।

দু' তিনবার ডাকাডাকির পর আবছা একটা শব্দ হল, 'উঁ'—'

'আমি বেরুচ্ছি।'

ঘুমন্ত জড়ানো গলায় মা বলল, 'তাড়াতাড়ি ফিরিস : বেশি রাত-টাত করিস না।'

বাড়ির সবাইকে আগেই জানিয়ে রেখেছি, আজ আমার এক বন্ধুর বিয়ে ; সেখানে যেতে হবে। কেউ তা অবিশ্বাস করে নি। বললাম, 'আচ্ছা—' তারপর আর দাঁড়ালাম না। বারান্দার গায়ে ইট সাজিয়ে সিঁড়ি বানানো হয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে বাড়ির বাইরের খোয়া-ওঠা সরু রাস্তায় এসে উঠলাম। এই রাস্তা ধরে উত্তরে মিনিট দশেক হাঁটলে যাট ফুটের মেইন রোড। সেখান থেকে এসপ্ল্যানেডের বাস পাওয়া যায়।

সরু রাস্তাটার দু ধারে বাড়িঘর। বেশির ভাগই টালির, টিনের, পুব বাঙলার ধাঁচে ক্যাচা বাঁশের। বিদ্যুৎ চমকের মতো হঠাৎ হঠাৎ একেকটা চমৎকার দোতলা কি তেতলা।

কুড়ি বাইশ বছর আগে যখন আমরা প্রথম এ জায়গাটায় আসি, চারদিকে শুধু ঝোপ জঙ্গল, হোগলাবন, নীচু জলা। কচুরিপানায় বোঝাই খাল। কি অগাধ শান্তি তখন এখানে। মাথার ওপর শঙ্খচিল আর হলদিবনা পাখিরা ডানা স্থির করে হাওয়ায় ভেসে বেড়াত। ছায়াচ্ছন্ন ঝোপের ভেতর দিয়ে ঝন ঝন আওয়াজ তুলে সজারু ছুটে যেত। দিনদুপুরে ঝাঁক ঝাঁক শিয়াল চারদিকে টহল দিয়ে বেড়াত। আর ছিল সাপ শুয়োর আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মেঠো ইঁদুর।

তারপর হঠাৎ একদিন মানুষ এল। রাতারাতি ঝোপঝাড় বন-বাদাড় উধাও। চোখের পলক পড়তে না পড়তে বাড়িঘরে চারদিক ছেয়ে গেল। এ জাগাটার নতুন নাম হল জবরদখল কলোনি। এখানকার সব বাসিন্দাই পূর্ব বাঙলার মানুষ।

আমাদের দেশও পূর্ব বাঙলাতেই। তবে সেখানকার কথা আমার বিশেষ কিছু মনে পড়ে না। ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমার সেই গ্রামটা এতদিন পর পূর্বজন্মের স্মৃতি হয়ে গেছে। যাই হোক দেশভাগের শিকার হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে একদিন সীমান্তের এপারে চলে এসেছিলাম। তবে জবরদখল কলোনিতে আমরা ঘর-টর তুলি নি। ওপার থেকে আসার সময় বর্ডার পুলিশের চোখে ধুলো ছিটিয়ে বাবা কিছু সোনা আনতে পেরেছিল। বাবার কৌশলটা ছিল অদ্ভুত। সুস্থ পায়ে ঢাউস ব্যাণ্ডেজ লাগিয়ে তার ভাঁজে ভাঁজে পাতলা পাতলা সোনার পাত সাজিয়ে নিয়েছিল। তারপর বর্ডারে এসে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এমন নিখুঁত অভিনয় করেছিল, পুলিশ কিছুই সন্দেহ করে নি।

ধোঁকা দিয়ে সোনা আনার ব্যাপারে বাবার ছিল দারুণ গর্ব। অনেক দিন পর্যন্ত লোক ডেকে ডেকে এ গল্প করেছে। বলবার মতো গল্পই বটে!

সেই সোনা বেচে জবরদখল কলোনির গা ঘেঁষে বাবা খনিকটা জমি কিনে বাড়ি তুলেছিল। এ সব সতের আঠার বছর আগের কথা।

আমি কিন্তু এখন বাবার কথা ভাবছি না। শহরতলীর শেষ মাথায় শান্ত নিরিবিলি জংলা জায়গাটা রাতারাতি কিভাবে জমজমাট উপনিবেশ হয়ে গেল তা নিয়েও আমার দুশ্চিন্তা নেই।

অন্যমনস্কের মতো আমি হেঁটে যাচ্ছিলাম। দু' পাশের ঘরবাড়ি, গাছপালা, মাথার ওপর পাখি-টাখি, কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছিলাম না।

আপনাদের তো বলেছিই, আমি মেয়েটা কিরকম। যেমন ভীরু তেমনি দুর্বল। এই মুহূর্তে বুকের ভেতরটা ভীষণ কাঁপছে। খুব ভয় লাগছে, আবার অসহ্য আনন্দও। সুখ আর ভীরুতা—যমজ স্রোতের

মতো একবার আমাকে ঢেউয়ের মাথায় তুলছে, আবার তক্ষুণি নামিয়ে আনছে।

মেইন রোডের মোড়ে এসে গেলাম। এখানে প্রচুর দোকানপাট, লণ্ড্রী, টী-স্টল। অন্য সময় জায়গাটা সরগরম হয়ে থাকে, ভিড়ে পা ফেলা যায় না। কিন্তু এই দুপুরবেলায় অন্য দৃশ্য। বেশির ভাগ দোকানেরই দরজা আধ-ভেজানো ; লোকজন বিশেষ চোখে পড়ছে না। ঝিমুনির মতো একটা ভাব জায়গাটাকে জড়িয়ে আছে।

রাস্তা পেরিয়ে ওধারে চলে গেলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাস এসে গেল এবং আমাকে কুড়িয়ে নিয়ে ছুট লাগাল।

এখন বাসেও ভিড়-টিড় নেই। দু' চারটে লোক এদিক-সেদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। জানালার ধার ঘেঁষে একটা সীটে বসে পড়লাম।

দুপুরবেলা রাস্তা ফাঁকা পেয়ে বাসটা দারুণ ছুটছিল। জানালার বাইরে সেই চেনা ছবি—রিফিউজি কলোনি, গভর্নমেণ্ট হাউসিং স্কীমের অসংখ্য ফ্ল্যাট, মাঝে মধ্যে ফাঁকা মাঠ, ছোট খাল, বাঁশের সাঁকো, ন্যাড়া গাছের ডালে মাছরাঙা, তারপরেই আবার 'স' মিল, দু একটা ছোট কারখানা, গোরস্থান। বারো চোদ্দ বছর ধরে দু' বেলা নিয়মিত এই সব দৃশ্য দেখতে দেখতে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। এখন চোখ বুজেও বলে দিতে পারি, বাসটা কোথায় এল, এখানে কী কী আছে।

বাসটা যত এগুচ্ছে, বুকের ভেতরকার সেই কাঁপুনিটা ততই বাড়ছে। ঝড়ের মতো কিংবা প্রাকৃতিক অন্য কোন বিপর্যয়ের মতো আমার মধ্যে কে যে চলছে, বাইরে থেকে বোঝা যাবে না।

মনটা অন্যদিকে ফেরাবার জন্য জানালার বাইরে তাকালাম।

এখন আশ্বিন মাস, শরৎকাল। গলানো গিনির মতো তাজা উজ্জ্বল রোদে চারদিক ভরে আছে। মাথার ওপর পেঁজা তুলোর মতো ভবঘুরে মেঘ। শরতের এই মেঘগুলোর মতি চঞ্চল, মন উড়ু-উড়ু, এক পলক তারা যদি কোথাও পা পেতে বসে। ফাঁকে ফাঁকে নীল নয়নের চকিত চাহনির মতো আশ্বিনের আকাশ।

কলকাতার আকাশ প্রায় সারা বছরই ধুলোমাখা, ধোঁয়ায় ঢাকা ; যেন বিষাদে সব সময় ঝাপসা হয়ে থাকে। শুধু এই আশ্বিনটা বাদ। এ সময় আকাশ যেন পালিশ-করা নীল কাচ।

আজ অনেক পাখি উড়ছে ; আর আছে ঝিরঝিরে এলোমেলো হাওয়া। মাঝে মাঝে চিনির গুঁড়োর মতো বৃষ্টি পড়ছিল। এত পাখি, এত হাওয়া, আকাশের এত অজস্র নীল—আশ্বিন মাসটা যেন চারদিকে জাদুকরের বেশে দাঁড়িয়ে।

শরৎকাল কিন্তু খুব বেশিক্ষণ আমাকে মুগ্ধ করে রাখতে পারল না। আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম। টের পাচ্ছি, নিয়তির মতো অদৃশ্য প্রবল একটা কিছু আমাকে স্রোতের টানে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি আমার নেই।

একসময় এসপ্ল্যানেড এসে গেলাম। এখান থেকে বাস বদলে শ্যামবাজারে যখন নামলাম, চারটে বাজতে মিনিট দশেক বাকি।

বাস স্টপেজের উল্টোদিকের গলিটায় আমাকে যেতে হবে। বিজনের সঙ্গে দিন কুড়ি বাইশ আগে একবার মোটে এখানে এসেছিলাম ; তাও বেশ রাত করে। তবু দেখেই চিনতে পারলাম। রাস্তাঘাট একবার দেখলেই আমার মনে থেকে যায় ; কিছুতেই আর ভুলি না।

ট্রাম-বাসের রাস্তা পার হয়ে গলিটায় ঢুকে পড়লাম। এখন বুকের সেই অসহ্য কাঁপুনিটা সারা গায়ে ঢেউয়ের মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে। এস্রাজে এলোপাতাড়ি ছড় টানার মতো রক্তের ভেতর কি ভেঙে পড়ছে। নিশি-পাওয়া মানুষের মতো হেঁটে চললাম।

সাপের মতো পাকানো গলিটার শেষ মাথায় সেই পুরনো দোতলা বাড়িটার কাছাকাছি আসতেই দেখতে পেলাম সামনের এক ফালি রকে বিজন দাঁড়িয়ে আছে। তার দু পাশে সুধীর সেন নিখিল বোস সুধাময় লাহিড়ী আর চিন্ময় রায়। ওরা বিজনের বন্ধু। সুধীর সেন নিখিল বোস বিজনের কলীগ ; এক অফিসে কাজ করে। সুধাময় লাহিড়ী একটা ছোটখাটো পাবলিসিটি ফার্মের চিফ কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। চিন্ময় রায় ব্যারাকপুরের কাছে একটা স্পনসর্ড কলেজে ইংরেজির লেকচারার।

বিজনরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার ডানধারের দেয়ালে কাঠের নেম-প্লেট আঁটা। তাতে লেখা আছে—শ্রীনরেশচন্দ্র নাগ এম. এ. বি, এল। প্লীডার এ্যাণ্ড ম্যারেজ রেজিস্ট্রার।

এক পলক নেম-প্লেটটা দেখলাম। তার পরেই আমার চোখ বিজনের মুখের ওপর স্থির হল।

বিজনের বয়স ছত্রিশ সাঁত্রিশের মতো। পাতলা ধারালো চেহারা। গায়ে এক গ্রাম বাড়তি মেদ নেই। নাকমুখ কাটা কাটা, জোড়া ঘন ভুরু। তীক্ষ্ণ চিবুক। হাত এত লম্বা যে হাঁটু ছুঁই ছুঁই করছে। গায়ের রঙ কালোও না, ফর্সাও না, দুয়ের মাঝামাঝি। চিবুকের তলায় মুসুর ডালের মতো একটা বড় লাল তিল। বয়েস একেবারে কম হয় নি; তবে এখনও চকচকে তাজা ভাবটা আলতোভাবে সারা মুখে মাখানো। খানিকটা দূর থেকে দেখলে ছেলেছোকরা মনে হয়।

বিজনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার চোখ কুঁচকে যেতে লাগল। অল্প অল্প রাগও হল। নাঃ, বিজনকে নিয়ে আর পারা যায় না।

ক'দিন আগে পছন্দ-টছন্দ করে একটা নক্‌শাপাড় তাঁতের ধুতি আর খাদি গ্রামোদ্যোগ থেকে কেটের পাঞ্জাবি কিনে দিয়েছিলাম। বার বার বলে দিয়েছিলাম আজ যেন ও দুটো পরে। কিন্তু আপনারাই দেখুন, একটা আধময়লা ধুতি আর স্ট্রাইপ দেওয়া শার্ট গায়ে দিয়ে হাজির হয়েছে। দাড়ি-টাড়ি অবশ্য কামিয়েছে, তবে চুল এলোমেলো, ভাল করে আঁচড়ায় নি পর্যন্ত। মুখে না একটু পাউডার, না সারা গায়ে একটু সেন্ট-টেন্ট। এ যেন অনেকটা মোড়ের দোকানে এক কাপ চা খেতে যাওয়া কিংবা একটা সিগারেট ধরানোর মতো ব্যাপার।

আপনারাই ভেবে দেখুন, আজকের দিনে কেউ এভাবে আসে! তিরিশ বছর বয়েস হলেও আমি তো একটা মেয়ে; আমার সাধ-টাধগুলো এখনও একেবারে মরে যায় নি। কিন্তু সেদিকে বিজনের খেয়ালই নেই। আপনারা ওকে চেনেন না কিন্তু চোদ্দ পনের বছর ধরে আমি তো দেখছি, কোন কথাই বিজনের মনে থাকে না। কানের ভেতর

যা-ই ঢুকিয়ে দিন না, তক্ষুণি ও ভুলে যাবে। এমন ভুলো মানুষ আর দ্বিতীয়টি দেখি নি। এই পৃথিবীতে বিজন যেন খানিকটা অন্যমনস্কের মতো বেঁচে আছে। সব জেনেও আমার রাগ কিন্তু যাচ্ছে না; আজকের দিনে একটু সেজে-টেজে এলে মহাভারত কি এমন অশুদ্ধ হয়ে যেত। এই দিনটা এ জীবনে আর তো আসবে না। অথচ দেখুন, ও যা বলেছে তাই করেছি। ওর পছন্দমতো চুল বেঁধেছি, নখে রঙ দিয়েছি, সোনার গয়না-টয়না পরেছি। সুন্দর করে নিজেকে সাজিয়েছি। কমলালেবু রঙের সিল্কের শাড়িটা বিজনই কিনে দিয়েছিল। চড়া রঙ-টঙ আমার ভাল লাগে না, তবু ও খুশি হবে বলে পরেছি। কিন্তু বিজন আমার কথা রাখে নি।

আচমকা সুধীর সেন চেঁচিয়ে উঠল, 'কি ম্যাডাম, রাস্তায় দাঁড়িয়েই শুভদৃষ্টিটা সেরে ফেলবেন নাকি?'

সুধীর সেনটা চিরকালের ফাজিল। চমকে চোখ নামিয়ে নিলাম। টের পেলাম, আমার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে যাচ্ছে।

চিন্ময় রায় বলল, 'এখানে আর দাঁড়াতে হবে না। চলুন, ভেতরে যাই।'

মুখ না তুলেই বকে উঠে এলাম। তারপর ওদের সঙ্গে বাঁ-হাতি দরজা দিয়ে সামনের ঘরে ঢুকে পড়লাম।

ঘরটা প্রকাণ্ড। মাঝখানে বড় একটা টেব্‌ল। তার ওধারে সিংহাসনের মতো গদিওলা বড় চেয়ার। এধারেও ক'খানা ছোট ছোট কাঠের চেয়ার। মাথার ওপর দু ব্লেডওলা পুরনো আমলের ফ্যান।

এক পাশে দেয়ালের ধার ঘেঁষে তক্তাপোশ; তার ওপর ছেঁড়া ময়লা ফরাস পাতা। অন্য তিনদিকের দেয়ালের গায়ে দশ বারোটা আলমারি। মোটা মোটা আইনের বই আর জার্নালে ঠাসা। আলমারিগুলো আর আস্ত নেই; কাচ-টাচ ভেঙে গেছে, ধুলোবালি জমে ওগুলোর গা-মাথা বোঝাই। দেখেই টের পাওয়া যায়, দু চার বছরের ভেতর আলমারিগুলো খোলা হয় নি। মোটা মোটা সব বই উই এবং আরশোলার খাদ্য হয়ে উঠেছে।

একেক জন একেকটা চেয়ারে বসে পড়লাম। প্লীডার-কাম-ম্যারেজ রেজিস্ট্রার রমেশচন্দ্র নাগকে এখন এ ঘরে দেখা যাচ্ছে না; তাঁর চেয়ারটা ফাঁকা, খুব সম্ভব ভেতরে আছেন।

নিখিল বোস থলথলে ভারী মানুষ, মাংস এবং হাড়-টাড়ের চাইতে তার গায়ে চর্বি বেশি। এই আশ্বিন মাসেও গলগল করে ঘামছিল। পাঞ্জাবিটা ফাঁক করে গলার কাছে বার কতক ফুঁ দিয়ে হাওয়া খাবার চেষ্টা করল সে। বলল, 'উহ্, কি গরম। একেবারে 'বয়েল্‌ড' হয়ে গেলাম।' বলেই দেয়ালের গায়ে সুইচ খুঁজে বার করে ফ্যানটা চালিয়ে দিল। ঘড়াং ঘড়াং করে পাখা ঘুরতে লাগল।

সুধাময় লাহিড়ী বলল, 'ফ্যানটা দেখেছিস? নাইনটিন টেনের মডেল। যেন সুদর্শন চক্র রে। মাথার ওপর ভেঙে না পড়লে হয়।'

সবাই হাসল। তারপর সুধীর সেন হঠাৎ আমাকে বলল, 'আপনার জন্যে খুব চিন্তায় ছিলাম ম্যাডাম—'

নখ খুঁটতে খুঁটতে আধফোটা গলায় বললাম, 'কেন?'

'কেন বুঝতে পারছেন না?'

সত্যিই পারছিলাম না; মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়লাম।

সুধীর সেন আবার বলল, 'এর আগে দু'বার ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে নোটিশ দিয়ে শেষ পর্যন্ত আসেন নি। মনে পড়ে? কি ভোগান যে ভুগিয়েছিলেন। বিজন শালার মুখ শুকিয়ে আমসি। ভাবলে বকুল-রাণী বুঝি ভো-কাট্টা হয়ে গেল।'

দারুণ লজ্জা পেয়ে গেলাম, আপনা থেকেই আমার চোখ আবার মেঝের দিকে নামল। সুধীর সেন ঠিকই বলেছে। বছর চারেক আগে একবার আর মাস আটেক আগে একবার, মোট দু'বার বিয়ের সব ব্যবস্থা করেও আমি ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে যাই নি। আমার দুর্বলতা আমার দ্বিধা আমার ভীরুতা যেতে দ্যায় নি। এরা যেন আঁচল ধরে আমাকে পেছন দিকে টেনে রেখেছিল। আজ অবশ্য দু হাতে সব বাধা সরিয়ে আমি বেরিয়ে পড়েছি। আমার মতো মেয়ের মধ্যেও যে

এতখানি দুঃসাহস ছিল, সেটাই আশ্চর্য!

চিন্ময় রায় খুব বেশি কথা-টথা বলে না। মোটা ফ্রেমের চশমার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে থাকে, আর হাসে। মাঝে মধ্যে ফাঁক-টাক বুঝে এক-আধটা মন্তব্য করে। সে বলল, 'এবারটা লাস্ট! আজ যদি না আসতেন, বিজন আপনার সঙ্গে আর রিলেশান রাখত না।'

মুখ ফিরিয়ে বিজনকে একবার দেখে নিলাম, সে-ও আমার দিকেই তাকিয়ে ছিল, চোখাচোখি হতে হাসল! আমি আবার মেঝের দিকে তাকালাম।

সুধীর সেন ওধার থেকে ভুম করে বলে বসল, 'আজ আপনাকে টেবিফিক দেখাচ্ছে। যা সেজেছেন না!'

আমার ঘাড় ভেঙে মাথাটা আরো অনেকখানি ঝুঁকে পড়ল।

সুধাময় লাহিড়ী বলল, 'ক্যামেরা এনেছি। যুগল মিলন হয়ে গেলে আজ গুনে গুনে সাঁইত্রিশখানা ছবি তুলব।'

বিজন কি বলতে যাচ্ছিল, বাড়ির ভেতর থেকে রমেশবাবু এ ঘরে এলেন! ভদ্রলোকের বয়েস ষাটের ওপরে; মাথাটা এর মধ্যেই সাদা হয়ে গেছে। খুব শান্ত সুদর্শন চেহারা। পরনে ধবধবে ধুতি আর হাফহাত পাঞ্জাবি, পায়ে শুঁড়তোলা চটি।

ওঁকে দেখে আমরা উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। ব্যস্তভাবে রমেশবাবু বললেন, 'বসুন আপনারা, বসুন।' বলতে বলতে সেই গদীওলা প্রকাণ্ড ফাঁকা চেয়ারটায় বসে পড়লেন। তারপর আমরাও বসলাম।

ভদ্রলোককে দেখে আমি কিন্তু ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছি। ঘাড় গলা ঘামে ভিজে উঠেছে। টের পাচ্ছি, কপালে-গালে-চিবুকে ঘামের দানা জমছে। অথচ আজ আমার জীবনে সব চাইতে সুখের দিন।

বিজনদের সঙ্গে মিনিট কয়েক গল্প-টল্প করে রমেশবাবু বললেন, 'এবার তা হলে আসল কাজটা সেরে নেওয়া যাক।'

সবার হয়ে সুধাময় তক্ষুণি সায় দিল, 'নিশ্চয়ই, দেরি করার কি দরকার। আমাদের একেক জনকে একেক জায়গায় ফিরতে হবে। দিনকাল যা হয়েছে, কখন ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে যাবে—'

আসল কাজটা সারতে আধঘণ্টাও লাগল না। রমেশবাবু কিছু প্রশ্ন করলেন, সম্মোহিতের মতো উত্তর দিয়ে গেলাম। আরো কি কি সব কথা হল। রমেশবাবু মন্ত্রের মতো, নাকি অঙ্গীকার জাতীয় কি একটা বলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বিজন আর আমিও বললাম। তারপর বড় একটা বাঁধানো খাতায় বিজন আর আমি পাশাপাশি সই করলাম। সুধাময়রাও সাক্ষী হিসেবে সই করল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে আমি বকুল, ভীরু দুর্বল একটা মেয়ে, একজনের আইনসম্মত স্ত্রী হয়ে গেলাম।

এই দিনটাকে ঘিরে আট দশ বছর আগেও আমার কিছু স্বপ্ন ছিল; সেই স্বপ্নের রেশ এখনও একেবারে ঝাপসা হয়ে যায় নি। এক দঙ্গল বরযাত্রী নিয়ে টোপর মাথায় দিয়ে এই বয়েসে যদি বিজন আমাদের বাড়ি যেত, খুবই লজ্জা পেতাম। তবে নিজেকে তো জানি, খুব একটা খারাপ লাগত না।

আমার এমন বিয়ে হবে, কে ভেবেছিল। একটা শাঁখ বাজল না, উলুর শব্দ শোনা গেল না। চালখেলা-জলখেলা-শুভদৃষ্টি, পুরুতের মন্ত্রপাঠ বাড়িভর্তি লোকজন-আলোটালো, আমাকে ঘিরে আনন্দের বান ডাকল না। এমন কি আপনজন বলতে যারা, তাদের কেউ এ বিয়েতে আসে নি। আমিই তাদের আসতে বলি নি।

কেউ না দেখুক, কেউ না জানুক, শ্যামবাজারের অন্ধ গলিতে ধুলোবালি-বোঝাই এক পুরনো বাড়িতে আমার বিয়েটা কিন্তু হয়ে গেল। আপনারাই বলুন, এমন বাহুল্যহীন কাটছাঁট মেড-ইজি-মার্কা বিয়েতে কোন মেয়ের মন ভরে!

বিজনরা রমেশবাবুর ফী মিটিয়ে দিয়ে একসময় বলল, 'এবার আমরা যাই।'

রমেশবাবু বললেন, 'আসুন—'

বিজনরা উঠে পড়ল। ওদের দেখাদেখি আমিও উঠলাম। হঠাৎ আমার কি হয়ে গেল; দু পা এগিয়ে রমেশবাবুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। মনে মনে যেন চাইছিলাম, আজকের দিনে কেউ আমাকে

একটু আশীর্বাদ করুক।

বাবার বয়েসী বৃদ্ধ মানুষটি পা সরিয়ে নিলেন না। আমার মাথায় একটা হাত রেখে প্রসন্ন মুখে বললেন, 'উকিল হিসেবে আমি ব্যর্থ কিন্তু বিয়ের পুরুত হিসেবে খুবই সাকসেসফুল। আমার হাত দিয়ে কম করে পাঁচ সাতশো বিয়ে হয়েছে ; সবগুলো হ্যাপি ইউনিয়ন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আপনারা সুখী হোন।'

বৃদ্ধ সৌম্য মানুষটির শুভকামনা এবং আশীর্বাদ খুব ভাল লাগল।

একটু পর আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম।

যখন শ্যামবাজারের এই গলিটায় ঢুকেছিলাম তখনও সূর্যটাকে দেখা যাচ্ছিল। গাঁদাফুলের রঙের মতো উজ্জ্বল টাটকা রোদ কলকাতার গায়ে আলতোভাবে জড়িয়ে ছিল।

এখন সূর্য নেই। পশ্চিম দিকের উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর ওধারে নেমে গেছে। আকাশে এক ধরনের মন্থর আলো। তবে এই আলো বেশিক্ষণ থাকবে না। জলে কালি গুলবার মতো বাতাসে কালচে রঙ মিশতে শুরু করেছে। আশ্বিনের এই দিনটার আয়ু খুব বেশি হলে আর মিনিট পনের কুড়ি। তারপরেই ঝপ করে সন্ধ্যে নেমে যাবে।

গলি পার হয়ে আমরা ট্রাম রাস্তায় এসে গেলাম। চারদিকের দোকানগুলোতে এর মধ্যেই আলো জ্বলে উঠেছে। কর্পোরেশনের আলোগুলোও এক এক করে জ্বলতে শুরু করেছে। ওধারের কোন্ একটা সিনেমাহলে শো ভেঙেছে, গল গল করে লোক বেরিয়ে আসছিল।

ফুটপাথগুলো হকারদের দখলে ; ইট আর কাঠের বাক্স-টাক্স সাজিয়ে ওরা দোকান সাজিয়ে বসেছে। তার ভেতর দিয়ে হাঁটাই মুশকিল।

ভিড় কাটিয়ে কাটিয়ে আমরা শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার দিকে এগুচ্ছিলাম। সন্ধ্যে নামছে দেখে আমার ভাবনা হচ্ছিল। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। আমাদের ওদিককার রাস্তায় আলো-টালো জ্বলে না। একটু রাত হলেই চারদিক নির্জন হয়ে যায়। অন্ধকার ফাঁকা রাস্তায় একা-একা হাঁটতে ভয় করে।

খুব আস্তে করে বিজনকে ডাকলাম, 'এ্যাই—'

বিজন মুখ ফেরাল, 'কী বলছ?'

'আমি এখন বাড়ি যাব।'

বিজন কি বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই আমার ডান পাশ থেকে সুধাময় ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'বাড়ি যাবেন মানে? আমি যে তা হলে এত আয়োজন-টায়োজন করলাম সেগুলো নষ্ট করবার জন্যে?'

আমি অবাক, 'কিসের আয়োজন?'

'গেলেই বুঝতে পারবেন।'

'কোথায় যাব?'

'আপাতত শ্যামবাজারের মোড়ে; সেখান থেকে ট্যাক্সি ধরে পাকপাড়ায়।'

'পাকপাড়ায় কী?'

নিজের বুকে একটা আঙুল রেখে সুধাময় নাটকের হীরোর মতো বলল, 'এই অধমের বাড়ি।'

পাকপাড়া হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে যেতে অনেক রাত হয়ে যাবে। ভেতরে ভেতরে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। ভয়ে ভয়ে বললাম, 'কিন্তু—'

'কী?'

'বেশি রাত হলে—'

আমাকে শেষ করতে দিল না সুধাময়, 'নতুন বউ কোথায় লজ্জায় জড়সড় হয়ে মুখ বুজে থাকবে, তা নয়, শুধু কথা।'

চিন্ময় গলা মোটা করে বলল, 'এখন আমরা বরকর্তা। যা বলব লক্ষ্মীমেয়ের মতো করতে হবে।'

আমাকে আর কোন কথাই ওরা বলতে দিল না। একটু পর

শ্যামবাজারে এসে ট্যাক্সিতে উঠলাম। গাড়িটা সোজা টালা ব্রিজের দিকে ছুটল।

পেছনের সীটে বসে স্পষ্টভাবে কিছুই ভাবতে পারছিলাম না। টুকরো টুকরো অসংলগ্ন নানারকম চিন্তা আমার মাথায় এলোমেলো ছায়া ফেলে যেতে লাগল।

হঠাৎ একসময় মনে পড়ল, এ বিয়েতে আমার মা-বাবা ভাই-বোনরা যেমন আসে নি তেমনি বিজনদের বাড়ী থেকেও কেউ আসে নি। ওদের ব্যারাকপুরের ভাড়া-বাড়িতে অনেকদিন আগে একবার নিয়ে গিয়েছিল বিজন। সেখানে আছে বিজনের বুড়ী বিধবা মা, এক বিধবা দিদি এবং তার এক গাদা কাচ্চাবাচ্চা। বাচ্চাগুলো পোকার মতো বাড়িময় কিলবিল করে বেড়ায়। আর আছে সধবাও না, বিধবাও না, কুমারীও না, এক ডাইভোর্স-হওয়া ছোট বোন। বিয়ের কথা তাদের বলে নি বিজন ; বলা সম্ভবও ছিল না। আমি তো ওর বাড়ির লোকদের চিনি। যেমন স্বার্থপর তেমনি—

ভাবনার সুতোটা কট করে ছিঁড়ে গেল। হঠাৎ সুধীরের গলা শুনতে পেলাম। সে বিজনকে বলছে, 'তোর বউকে কী বলে ডাকতে হবে রে ?'

বিজন বলল, 'তোর চাইতে আমি ছ'মাসের বড়। বৌদি বলে ডাকবি।'

'ছ'মাসের বড় আবার বড় নাকি ? বৌদি-টৌদি বলতে পারব না।'

চিন্ময় আচমকা বলে উঠল, 'তা হলে ছোট মাসিই বলিস।'

সবাই হুল্লোড় বাধিয়ে হেসে উঠল। অনুভব করলাম, আমার কানের লতি লাল হয়ে উঠেছে।

সুধীর এবার আমার দিকে ফিরল, 'আপনিই বলে দিন, কী বলে ডাকব ?'

আবছা গলায় বললাম, ইচ্ছে হলে নাম ধরে ডাকতে পারেন।'

বিজনের কানে টুসকি মেরে সুধীর বলল, 'শোন্ শালা, তোর বউ কী বলছে—'

চিন্ময় বিজনকে বলল, 'বিয়ে করবার জন্যে তো দশ-সালা

পরিকল্পনা নিয়েছিলি। এবার বউ নিয়ে সংসার করতে ক'বছর লাগাবি?'

চোখ অল্প তুলে বিজনকে দেখে নিলাম। তার মুখটা এই মুহূর্তে ভীষণ করুণ দেখাচ্ছে, আর বড় দুঃখী। কয়েক পলক। তারপরেই তুড়ি মেরে সব দুঃখ উড়িয়ে দেবার মত করে হেসে হেসে বিজন বলল, 'দেখি ক'বছর লাগে। হয়তো আরেকটা টেন-ইয়ার মাস্টার প্ল্যান করতে হবে।'

'তোদের দেখছি দশ বছর ছাড়া কোন প্ল্যান হয় না!'

'যা বলেছিস।'

চিন্ময়ের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। নাইনটিন সিক্সটিতে আমরা ঠিক করেছিলাম বিয়ে করব। সেই বিয়ে হল আজ নাইনটিন সেভেনটিতে এসে। বিজন আর আমার মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি হয়ে গেছে। এখন বিয়েটাই শুধু হবে; পরে দু'জনের সুবিধামতো আমরা সংসার পাতব। সেই সুযোগটা কবে আসবে তা অবশ্য এক্ষুণি বলা যাবে না।

ট্যাক্সিটা টালা ব্রিজ পার হয়ে আরো খানিকটা উত্তরে গিয়ে ডান দিকে ঘুরল। তারপর পলক পড়তে না পড়তেই হুস করে মণীন্দ্র রোডের একটা ছিমছাম একতলা বাড়ির দরজায় এসে থামল।

দরজাটা খোলা ছিল! ট্যাক্সি থেকেই দেখতে পেলাম, ক'টি উৎসুক মুখ সেখানে ভিড় করে আছে। একটি ফর্সা গোলগাল সুখী চেহারার বউ, আমারই বয়সী হবে—সবার সামনে দাঁড়িয়ে। তার পাশে একটি কিশোরী, বাইশ তেইশ বছরের একটি যুবতী এবং দু তিনটে ছোট ছেলেমেয়ে।

আমাদের ট্যাক্সি থামতেই কিশোরী মেয়েটি গাল ফুলিয়ে শাঁখ বাজাতে লাগল। গোলগাল বউটি ছুটে এসে ট্যাক্সির দরজা খুলে আমার একটা হাত ধরে বলল, 'আসুন ভাই, আসুন—'আমাকে নামিয়ে এনে বিজনের দিকে ফিরে খুব রগড়ের গলায় বলল, 'চমৎকার বউ হয়েছে বিজন ঠাকুরপো; একটু সামলে সুমলে রাখবেন; নইলে দেখবেন অন্যের নজর লেগে যাবে।'

বিজন হেসে হেসে বলল, 'মন্তর দেওয়া আছে; নজরে কিছু হবে না।'

বউটি হেসে হেসে ঘাড়-টাড় বাঁকিয়ে বলল, 'খুব-খুব—'

'খুবই তো।'

কথা বলতে বলতে বিজন ট্যাক্সি থেকে নেমে এল ; তার পেছন পেছন সুধাময় চিন্ময় সুধীর আর নিখিল। ওদের মধ্যে কেউ একজন ভাড়া মিটিয়ে দিতেই ট্যাক্সিটা চলে গেল।

আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। শাঁখ বাজিয়ে রাস্তা থেকে ডেকে নেবার জন্য কেউ দরজায় দাঁড়িয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করবে, এছিল অকল্পনীয়। সব ব্যাপারটাই যেন এক মনোরম ষড়যন্ত্রের মতো। আপনারাই বলুন, ষড়যন্ত্র ছাড়া একে আর কী বলতে পারি।

পকেট থেকে একটা মোটা চুরুট বার করে লাইটার দিয়ে ধরিয়ে নিল সুধাময়। তারপর বউটিকে দেখিয়ে আমাকে বলল, 'আসুন আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই।'

বউটির সঙ্গে সুধাময়ের সম্পর্ক কী, মোটামুটি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সুধাময় আবার মুখ খুলবার আগেই কাচ ভাঙার শব্দের মতো মিষ্টি একটা ঝঙ্কার দিয়ে বউটি বলল, 'তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। পরিচয় টরিচয় যা করবার নিজেরাই করে নিচ্ছি।' বলেই আমার দিকে ফিরল। বলল, 'আমার নাম বিজু, মানে বিজলী।' সুধাময়কে দেখিয়ে বলল, 'আর এই চুরুটমুখো আমার প্রাণেশ্বর।'

ওরা যে দারুণ সুখী, এক পলকেই টের পাওয়া গেল। আমার ভীষণ ভাল লাগছিল। আজকাল সুখের সংসার ক'টাই বা চোখে পড়ে! আমার সব চাইতে কাছে যারা অর্থাৎ বাবা আর সৎ-মা, জ্ঞান হওয়া থেকেই দেখে আসছি, ওদের সম্পর্কটা নিয়ত যুদ্ধের। শুধু কি ওরাই, এই তিরিশ বছরের জীবনে কম সংসার তো দেখলাম না, কিন্তু সুখী স্বামী-স্ত্রী ক'টা আর চোখে পড়েছে! বাবা আর সৎ-মার মতো হয় যুদ্ধ করে, নয়তো লোকদেখানো জোড়াতাড়া দিয়ে কোনরকমে সবাই চালিয়ে যাচ্ছে।

যাই হোক, সুধাময়দের বাড়ি আগে আর কখনও আসি নি। এলে বিজলীর সঙ্গে কবেই আলাপ-টালাপ হয়ে যেত। শুধু সুধাময়ই নাকি, বিজনের কোন বন্ধুর বাড়িই যাই নি। বিজন অবশ্য অনেক

বার নিয়ে যেতে চেয়েছে ; ওর বন্ধুরা অনুরোধ করেছে ; কিন্তু আমার ভীষণ লজ্জা করতো।

বিজলীর পরিচয় জানা হয়ে গেছে। এবার নিজের নাম-টাম বলতে যাব, তখনই বাধা পড়ল। বিজলী তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'কিছু বলতে হবে না ; আপনার নাম আমি জানি। শুধু নামই না, নাড়ি-নক্ষত্র সব।' পাতলা ঠোঁটে দাঁত বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে সে হাসতে লাগল।

খুব আস্তে করে বললাম, 'কার কাছে শুনেছেন ?'

'কাব কাছে আর শুনতে পারি বলুন।' আঙুল দিয়ে বিজনকে দেখিয়ে বিজলী বলল, 'ওই যে আসামী, ওর কাছে। ভদ্রলোক যখনই এ বাড়ি আসে, একটা নামই জপ করে যায়। শুধু বকুল বকুল আর বকুল। যেন বকুল ছাড়া বাঙলা ভাষায় আর কোন শব্দ নেই।'

হঠাৎ সুধীর সেনের ভারী মোটা গলা শোনা গেল, 'রাস্তার ওপরেই পার্লামেন্টের অধিবেশন বসে গেল যে! দুটো মেয়ে একসঙ্গে হলে আর রক্ষে নেই, জোড়া ইঞ্জিন চলতে থাকে। দয়া করে চারদিকে একবার দেখা হোক।'

চমকে মুখ তুলতেই দেখতে পেলাম, আশপাশের বাড়িগুলোর দরজা-জানালায় ভিড় জমে গেছে। অনেকগুলো কৌতূহলী চোখ আমাদের ওপর স্থিব, নিবদ্ধ।

বিজলী হাত মুঠো করে সুধীর সেনকে একটা কীল দেখাল। তারপর আমার হাত ধরে বলল, 'চলুন ভাই—'

সেই কিশোরী মেয়েটি এখনও দরজায় দাঁড়িয়ে গাল ফুলিয়ে ফুলিয়ে শাঁখ বাজিয়ে যাছে। একুশ বাইশ বছরের তরুণীটি একদৃষ্টে আমাকে দেখতে দেখতে মুখ টিপে হাসছিল। বাচ্চাগুলোর চোখেও পলক পড়ছিল না।

বাড়িব ভেতর যেতে যেতে জেনে ফেললাম, কিশোরীটি বিজলীর মেয়ে, তরুণীটি বোন আর বাচ্চাগুলো আশপাশেব বাড়ির। কিশোরীর নাম খুকু, তরুণীর রুবি।

চমৎকার সাজানো একটা ঘরে এনে বিজলী আমাকে বসাল।

বিজনবাও সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল ; তারাও চারপাশের সোফা-টোফায় বসে পড়ল।

বিজলী ঘরের সবাইকে লক্ষ্য করে বলল, 'এখন কী খাবেন বলুন ? চা না কফি ?'

মাথার পেছন দিকে দু হাত ছড়িয়ে আর্ম-চেয়ার হতে হতে চিন্ময় বলল, 'এই গরমে চাও না, কফিও না।'

'তবে ?'

'ঘোলের সরবৎ।'

বিজনরা গলা মিলিয়ে সায় দিল, 'গরমে সরবতই আদর্শ পানীয় !'

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে কি ভেবে বিজলী ঘুরে দাঁড়াল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখানে এদের মধ্যে বসে থেকে কী হবে ? আসুন আমার সঙ্গে—' বিজনকে বলল, 'নিয়ে যাচ্ছি মশাই, দেখবেন আবার হার্ট ফেল না হয়ে যায়—'

বিজন বলল, 'হার্ট আমার বেশ ষ্ট্রংই আছে।'

নাকটাক কুঁচকে রগড়ের সুরে বিজলী বলল, 'জানা রইল।' তারপর আমাকে নিয়ে চলে গেল।

এখান থেকে বেরিয়েই সরবত করতে বসল না বিজলী। প্রথমে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজের ঘর-সংসার দেখাতে লাগল। ওদের বাড়িটা ছোটখাটো হলেও বেশ ছিমছাম আর ঝকঝকে। মোট চারখানা ঘর। তা ছাড়া কিচেন, বাথরুম।

একটা ঘর আগেই দেখেছি। আরো দু' খানা ঘর দেখলাম, কিচেন-বাথরুম দেখলাম। কিন্তু দক্ষিণ দিকের ঘরটা কিছুতেই দেখাল না বিজলী! উঁকিঝুঁকি দিয়ে যে দেখে নেব, তার উপায় নেই। শেকল তুলে তালা লাগিয়ে রাখা হয়েছে।

অভদ্রতা জেনেও ফস করে জিজ্ঞেস করলাম, 'এ ঘরটা দেখালেন না ?'

বিজলী বলল, 'দেখাব ; তবে এখন না।'

আমার খুব কৌতূহল হচ্ছিল। বললাম, 'কী আছে ও ঘরটায় ?'

চোখের তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ আমাকে দেখল বিজলী।

রহস্যময় হেসে আচমকা আমার গাল টিপে দিয়ে চাপা নীচু গলায় বলল, 'বাবা রে বাবা, মেয়ের আর তর সয় না।'

খুকু আর রুবি আমাদের পায়ে পায়ে ঘুরছিল। লক্ষ্য করলাম, ওরাও হাসছে। চোখাচোখি হতেই হাসি চেপে গম্ভীর হবার চেষ্টা করল মেয়ে দুটো, কিন্তু বৃথাই। ঠোঁটে-চোখে-গালে-চিবুকে অবরুদ্ধ হাসি চুঁইয়ে চুঁইয়ে এসে আটকে যাচ্ছে।

কোথায় যেন একটা গভীর চক্রান্ত চলছে। সে যাক, আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না।

বাড়ি-টাড়ি দেখানো হলে আমাকে নিয়ে রান্নাঘরে এসে সরবৎ বানাতে বসল বিজলী। খুকু রুবি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকল। বাচ্চাগুলো সামনের প্যাসেজটায় ঘুরঘুর করতে লাগল।

বিজলী বলল, 'ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে কখন এসেছিলেন?'

বিজলী সবই জানে, দেখা যাচ্ছে। আস্তে করে বললাম, 'চারটের সময়।'

'বিজন ঠাকুরপোদের সঙ্গে?'

'না। আমি একলাই এসেছি। ওরা আমার আগে এসে অপেক্ষা করছিল।'

বিজলী মুখ ফিরিয়ে খুকু রুবিকে বলল, 'তোরা এখান থেকে যা তো। বড়রা যখন কথা বলবে, ছোটদের সেখানে থাকতে নেই।' রুবিরা চলে গেলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওরা থাকলে ফ্রী-লি গল্প করা যাবেনা। আমার মুখ আবার দারুণ আলগা। কখন আবার কী বেরিয়ে যাবে!'

আমি হাসলাম।

বিজলী আবার বলল, 'আপনারা অনেকদিন স্ট্রাগল করেছেন। বিয়েটা যে শেষ পর্যন্ত হবে, এ আশা আমরা ছেড়েই দিয়েছিলাম। বিজন ঠাকুরপো একেক দিন এসে মুখ কালো করে বসে থাকত। যাক, বিয়ে হয়ে গেছে। আমি যে কি খুশী হয়েছি!'

মুখ নামিয়ে নখ খুঁটতে লাগলাম।

বিজলী বলতে লাগল, 'বিজন ঠাকুরপোর কাছে শুনেছি, দশ বছর

আগেই আপনাদের বিয়ে সেটেল্‌ড্‌ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দু'বার নোটিশ দিয়েও আপনি নাকি ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে আসেন নি! কেন?'

আমি যে দুর্বল, আমি যে ভীরু, সে কথাটা আর বললাম না। শুধু বললাম, 'এই নানারকম ঝঞ্ঝাট—'

বিজলী বলল, 'অথচ দেখুন, আপনাদের মতো আমাদের স্ট্রাগল্‌ও কম ছিল না। আমার বাবা খুব বড়লোক, বিরাট স্ট্যাটাস। আর সুধাময় গবীব ঘরের ছেলে। বছর পনের আগে, ও তখন সবে আর্ট স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়েছে, রোজগার টোজগার কিছু নেই, বুঝতেই পারছেন আমার বাবাব দিক থেকে কিরকম বাধা আসতে পারে। আমরা কিন্তু কিছুই মানি নি।'

এ গল্প আমার জানা। আমার সাহস উস্কে দেবার জন্য বিজন প্রায়ই বিজলীদের উদাহরণ দিত। কাছাকাছি এত বড় একটা দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও আমার আজন্মেব ভয়টা কিছুতেই কাটত না।

বিজলী থামে নি, 'আসল কথাটা কী জানেন?'

'কী?

'চোখকান বুজে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হয়। আমার বিয়ের পর চার বছর বাবা-মা কোন সম্পর্ক রাখে নি। তারপর আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে গেছে। আপনাদেরও ঠিক হয়ে যেত। একটু সাহসের অভাবে দশটা বছর নষ্ট হল।'

অস্পষ্ট গলায় বললাম, 'সবাই কি ঝাঁপ দিতে পারে?'

একটু চুপ। মুখের সঙ্গে সঙ্গে হাতও চলছিল বিজলীর। নক্সাকরা কাচের গেলাসে গেলাসে সরবৎ ভর্তি করে ট্রে-তে দিতে দিতে ডাকল 'রুবি - খুকু—'

রুবিরা এলে ওদের হাতে সরবতের ট্রে দিয়ে বাইরের ঘরে, যেখানে বিজনরা বসে আছে, পাঠিয়ে দিল বিজলী। আমাদের জন্যও সরবৎ রেখে দিয়েছিল সে! একটা গেলাস আমাকে দিয়ে আরেকটা নিল বিজলী। তারপর বলল, লতিকা মাধবী আর অরুণা আজ যদি থাকত খুব আনন্দ হত। ওরা যা হুল্লোড় করতে পাবে!'

জিজ্ঞেস করলাম, 'ওঁরা কারা ?'

'লতিকা হল সুধীর ঠাকুরপোর মিসেস। অরুণা নিখিল ঠাকুরপোর। মাধবী চিন্ময় ঠাকুরপোর।'

আমি চুপ করে রইলাম।

বিজলী বলতে লাগল, 'এমন একটা দিনে বিয়ে লাগালেন যে ভাই ওরা আসতে পারল না।'

'কেন, কী হয়েছে ?'

'অরুণা কাল অপারেশন করিয়েছে ; অন্তত দিন পনের তার নড়াচড়া বারণ।'

'কিসের অপারেশন ?'

'দারুণ বাচ্চা হচ্ছিল ওর ; আট বছরে পাঁচটা—' বিজলী হাসতে লাগল, 'নিখিল ঠাকুরপোটার তো কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। সে যাকগে, অরুণা আর ফাঁসতে রাজী না। তাই কাটিয়ে কুটিয়ে নিল। আপনাকে আগেভাগেই বলে রাখছি ভাই, বিজন ঠাকুরপোকে একদম আস্কারা দেবেন না। ম্যাক্সিমাম দুটো বাচ্চা—ব্যস্—'

আমার কান-টান ঝাঁ-ঝাঁ করছে ; নাকের ডগায় দানা দানা ঘাম জমতে লাগল।

বিজলী হয়তো আমাকে লক্ষ্য করে নি ; আপন মনে বলে যেতে লাগল, 'মাধবী হাজারিবাগে বাপের বাড়ি গেছে, লতিকার ছেলের খুব জ্বর। তাই কেউ আসতে পারে নি।' বলতে বলতে হঠাৎ আমার কপালের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল বিজলী। বলল, 'এ কি !'

ওর বলার ধরনে এমন কিছু ছিল যাতে চমকে উঠলাম, 'কী হয়েছে।'

'বিজন ঠাকুরপোটা কী !'

'কেন, কী করেছে ?'

'কী করে নি, তাই বলুন ! নতুন বউ ; তাকে একটু সিঁদুর টিঁদুর পরায় নি পর্যন্ত ! সিঁদুর না হলে বউ বলে মনে হয় ! আসুন তো—' আমি উঠবার আগেই একটানে আমাকে পাশের ঘরের একটা ড্রেসিং টেবিলের সামনে নিয়ে বসিয়ে দিল বিজলী। তারপর কিছু বুঝবার

সময় না নিয়েই সিঁথিতে একগাদা সিঁদুর লাগিয়ে দিল, কপালে দিল ডগডগে মস্ত এক টিপ।

আয়নার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। নিজেকে আমি আর চিনতে পারছিলাম না। একটুখানি সিঁদুর আমাকে একেবারে বদলে দিয়েছে। কিছুক্ষণ আগে আপনারা যে বকুলের কথা শুনেছেন সে কি এ-ই?

আমার গলা শুকিয়ে আসছিল। বললাম, 'এ কী করলেন ভাই!'

আমার চিবুকের তলায় একটা আঙুল রেখে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মুখটা দেখতে লাগল বিজলী। মুগ্ধ গলায় বলল, 'কী সুন্দর দেখতে লাগছে এখন!'

আমি বাড়ির কথা ভাবছিলাম। এই সিঁদুর-টিঁদুর নিয়ে ফিরব কি করে? বাবা, সৎ-মা, হাবু-বাচ্চু-গণেশ বা পাড়ার লোকদের চোখ যখন ছুঁচের মতো আমার মুখে বিঁধতে থাকবে, কী কৈফিয়ৎ দেব? আমার মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে হিম নামতে লাগল। ভীষণ দুর্বল বোধ করতে লাগলাম। আবছা গলায় বললাম, 'আপনি আমাকে খুব বিপদে ফেললেন ভাই।'

আমার কথা যেন শুনতেই পেল না বিজলী। বলল, 'এসো তো ভাই আমার সঙ্গে।' বলেই জিভ কাটল, 'এই রে, 'তুমি' করে বলে ফেললাম যে—'

'তাতে কী হয়েছে। তুমি করেই বলবেন—'

'বলতে পারি। তবে এক শর্তে—'

'কী?'

'আমাকেও তুমি করে বলতে হবে।'

বিজলীর আন্তরিকতা, তার সরল সুন্দর স্বভাব আমাকে মুগ্ধ করছিল। প্রথম থেকেই সে এমনভাবে আমার সঙ্গে ব্যবহার করছে যেন আমি তার কতকালের চেনা। তার জন্যই আজকের এই ম্যাড়মেড়ে ন্যাড়া দিনটা উৎসব-উৎসব লাগছে। একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'আচ্ছা—'

আমার গালে টুসকি মেরে বিজলী খুশির গলায় বলল, 'লক্ষ্মী

মেয়ে। এখন এসো তো আমার সঙ্গে—' কিছু জিজ্ঞেস করবার সুযোগ না দিয়ে টানতে টানতে বিজলী আমাকে বাইরের ঘরে বিজনদের কাছে নিয়ে গেল।

ওরা জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছিল। বিজলী বিজনকে ডাকল, 'ও মশাই, শুনছেন—'

বিজন ঘাড় ফেরাতেই বিজলী বলল, 'উঁহু উঁহু, আমার দিকে না। এদিকে তাকান; দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা—'বলেই আমাকে সামনে ঠেলে দিল।

বিজন আমার দিকে তাকিয়ে আর চোখ ফেরাতে পারল না। পলকহীন দেখতেই লাগল। বিজনের এই চোখ আমার কতকালের চেনা।

নিখিল বলল, 'আরে আরে, এ কে রে? চিনি চিনি করি, চিনিতে না পারি—'

সুধাময় বলল, 'আমার থ্রম্বসিস হয়ে যাবে মাইরি।'

আচমকা সুধীর চেঁচিয়ে উঠল', 'এই শালা বিজন; তোর চোখের তারা ফিক্সড্ হয়ে গেছে যে রে। মরে গেলি নাকি!'

সবাই হুল্লোড় বাধিয়ে হেসে উঠল।

বিজন প্রথমটা চমকে গিয়েছিল। তারপর বোকাটে মুখে হাসতে লাগল।

আমি কারো দিকেই তাকাতে পারছিলাম না। ঘাড় ভেঙে মাথাটা ঝুলে পড়ছিল। হাত-পায়ের জোড় আলগা-আলগা হয়ে আসছিল। আজ বাড়ি থেকে বেরিয়েই ঘামতে শুরু করেছিলাম। এখন জামা-কাপড় ভিজে একাকার। শরীরে জলীয় পদার্থ আজ আজ একটুও থাকবে না মনে হচ্ছে। সব বেরিয়ে যাবে।

বিজলী আমাকে একটা সোফায় বসিয়ে দিল। তারপর নানারকম ঠাট্টা-ফাট্টা এবং গল্প চলতে লাগল। আস্তে আস্তে আমার আড়ষ্টতা কেটে যেতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারলাম না, কপাল আর মাথাভর্তি জ্যাবজেবে সিঁদুর নিয়ে কেমন করে বাড়ি ফিরব?

একসময় সুধীর বলল, 'বিজন শালার বিয়েটা ঠিক বিয়ের মতো হল

না। কোথায় সানাই বাজবে, পোলাও মাংসের গন্ধে চারদিক মাত হয়ে যাবে, কোমরে গামছা বেঁধে পরিবেশন করব, তা না। শালা খাতায় সিগনেচার মেরে দিয়ে করিয়ে আনলাম।' একটু থেমে আবার বলল, 'আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

'কী?' সবাই সুধীরের দিকে তাকাল।

'বিজনের বিয়েটা ভাল করে সেলিব্রেট করতে হবে।'

'নিশ্চয়ই।' সবাই একসঙ্গে সায় দিল, 'প্রস্তাব পাশ।'

সুধাময় বলল, 'কিভাবে সেলিব্রেট করতে চাস, কিছু ভেবেছিস?'

সুধীর বলল, ' নেক্সট্ মান্‌থে কোন ছুটির দিনে একটা স্টিমার পার্টি দিলে কেমন হয়? ভোরবেলা একটা লঞ্চটঞ্চ ম্যানেজ করে বেরিয়ে পড়া যাবে। সারাদিন হৈ-হুল্লোড় করব। খাওয়া-দাওয়া, গান-বাজনা, যার যা খুশি চালিয়ে যাবে, তারপর সন্ধ্যাবেলা ফিরে আসব।'

সুধাময় বলল, 'গ্র্যাণ্ড। নেক্সট্ মান্‌থেই তো পুজো। পুজোর মধ্যে একটা দিন ফিক্স কর।'

'ঠিক আছে। তবে একটা কথা '

'কী?'

'বাজে ভেজাল নেওয়া হবে না। ওনলি আওয়ার ফ্রেণ্ডস এ্যাণ্ড দেয়ার ওয়াইভস্। অনেক বন্ধু আজ আসতে পারে নি, তাদের বলতে হবে। কেউ কিন্তু বাচ্চা-কাচ্চা নিতে পারবে না; ট্যাঁ-ভ্যাঁ জোটালে আনন্দের বারোটা বেজে যাবে।' বলতে বলতে সুধীর নিখিলের দিকে তাকাল, 'এ্যাই, তোর যেন ক'টা ছেলেমেয়ে?'

চোরের মত মুখ করে নিখিল বলল, 'পাঁচটা—'

পাঁচটা তো ছ' মাস আগে বলেছিলি রে; এর ভেতর আর প্রোডাকশান দিস নি? তোর যা কারবার।'

বিজনের কাছে শুনেছি, নিখিলের ছেলেপুলে বেশি বলে বন্ধুরা তার পেছনে দারুণ লাগে। দু চার মাস পর পরই জিজ্ঞেস করে, আর সংখ্যা বৃদ্ধি হল কিনা। নিখিল তাতে ভীষণ ক্ষেপে যায়।

ঘরের সবাই খুব হাসছিল। নিখিল ধাঁ করে পাশের টেবল্ থেকে

একটা ফুলদানি তুলে সুধীরের দিকে তাক করল, 'শালা, তোকে খুন করে ফেলব।'

দু হাত জোড় করে সুধীর বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। বুঝলাম এর মধ্যে নতুন প্রজা সৃষ্টি হয় নি। না জেনে অবোধ বালক আমি, জিজ্ঞেস করে ফেলেছি।'

চিন্ময় ওধার থেকে বলল, 'তোর কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই সুধীর।'

সুধীর বলল, 'কি রকম ?'

ছ' মাসে মানুষের বাচ্চা হয় ?'

লক্ষ্য করলাম চিন্ময়ের মুখটা সরল ভালমানুষের মতো। কিন্তু চোখ আধবোজা এবং ঝকঝক করছে ; ঠোঁট দুটো টেপা। টের পাওয়া গেল, সুধীরকে উস্কে দেবার জন্যই ওই রকম একটা নিরীহ প্রশ্ন করছে চিন্ময়।

সুধীর বলল, 'আরে কি আশ্চর্য, তাই তো ! এত ছেলেপুলে দেখে ভেবেছিলাম, নিখিলটা হয়তো সাব-হিউম্যান গ্রুপের—'

ফুলদানিটা উঁচুতে তুলে নিখিল গর্জে উঠল, 'আবার শালা, আবার—'

হাত জোড় করাই ছিল। মাথাটা ঝুঁকিয়ে মজার ভঙ্গি করে সুধীর একটানা বলে যেতে লাগল, 'ক্ষমা, ক্ষমা, ক্ষমা, ক্ষমা—'

নিখিল ফুলদানিটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'এক নম্বরের খচ্চর।'

মাথা তুলে সুধীর বলল, আমাকে যা খুশি বল। কিন্তু ছানাপোনা-গুলোকে এবারটা অন্তত আনিস না ভাই। তোর তো আবার হোল ফ্যামিলি ছাড়া নড়ার অভ্যাস নেই। গডস্ সেক্, একদিনের জন্য তোর বাহিনীকে ফাদার-ইন-ল'র বাড়ি চালান করে দিস।'

বিজলী বলল, 'বেশি বাহিনী বাহিনী করবেন না মশাই। অরুণা অপারেশন করিয়ে নিয়েছে। ফিউচারে আর ফাজলামো করার চান্স নেই।'

ব্যাপারটা কেউ জানত না। সুধীররা নিখিলের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে

পড়ল, 'শালা পাষণ্ড, এরকম একটা কাণ্ড করলি। আমাদের জ ানালি নি পর্যন্ত !'

নিখিল উত্তর দিল না। সিগারেট ধরিয়ে চোখ বুজে ধোঁয়ার গোল গোল আংটি ছাড়তে লাগল।

চিন্ময় জিভের ডগায় আক্ষেপের শব্দ করে বলল, 'ভারতীয় প্রজাতন্ত্র সম্ভাব্য এক ডজন ভোট থেকে বঞ্চিত হল।'

ঘরের সবাই হেসে উঠল। তার মধ্যেই হঠাৎ বিজলীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'এ কি মশাই, এ কি !'

দেখলাম, বিজলী একদৃষ্টে বিজনের দিকে তাকিয়ে আছে। থাকতে থাকতে তার ভুরু টুরু কুঁচকে যেতে লাগল।

বুঝতে না পেরে বিজন বলল, 'কী হল ?'

বিজনের জামা কাপড়ের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বিজলী বলল, 'এই গাঁটকাটার বেশে বিয়ে করতে গিয়েছিলেন ! আপনি তো অদ্ভুত লোক !'

বিজলী যা বলল তা আমারই মনের কথা। বিজনকে একলা পেলে আমিই বলতাম, হয়তো এভাবে না। তবু বিজলীর রগড় আর খোঁচা খুব ভালো লাগল।

বিজন ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে চট করে একবার আমাকে দেখে নিল। তারপর বলল, সেজেগুজে ববেশে আসতে হলে এ জীবনে আমার আর বিয়ে করা হত না।'

'মানে ?' বিজলীর কপালে গভীর রেখায় ভাঁজ পড়তে লাগল।

'আপনি তো আমাদের বাড়ির খবর জানেন। সেজেটেজে বেরুতে হলে হাজার রকম জবাবদিহি করতে হত। · তার চাইতে এই ভাল।' বিজন বিজলীকে বলছিল ঠিকই কিন্তু লক্ষ্যটা আমি। সুযোগ পেয়েই সেই নতুন ধুতি পাঞ্জাবিটা পরে না আসার কৈফিয়ৎ দিয়ে রাখল বিজন। কম চালাক সে।

বিজলী মাথা হেলিয়ে বলতে লাগল, 'ভালো তো বলবেনই। বেশ খেলেন দেলেন গোঁফ মুছে বাড়ি চলে গেলেন, কেউ টেরটি পেল না।

বিজন হাসতে লাগল, 'যা বলেছেন !'

'কিন্তু ওটি হবে না। বিয়ের দিনে এভাবে আপনাকে থাকতে দেব না।'

বিজন হাসিমুখে বলল, 'কী করতে হবে বলুন। বান্দা প্রস্তুত—'

বিজলী বলল, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

বিজন সুবোধ বালকের মত উঠে পড়ল। কিছুক্ষণ পর আবার যখন বিজলীর সঙ্গে ফিরে এল, তাকে আর চেনা যায় না। ধবধবে ধুতি-পাঞ্জাবিতে বিজনকে দারুণ দেখাচ্ছে। বুঝতে পারলাম, এই পোশাকগুলো সুধাময়ের।

বিজলীর হাতে পড়ে আমার মতো বিজনও বদলে গেছে। খুব ভাল লাগছিল তাকে।

আমার পাশে বিজনকে বসিয়ে দিয়ে বিজলী সুধীরদের দিকে ফিরে বলল, 'দেখুন এবার কি রকম লাগছে।'

চিন্ময় বলল, 'ফাইন। গাঁটকাটাটাকে বেড়ে দেখাচ্ছে তো।'

'তা হলে বলুন, কি রকম একখানা ম্যাজিক টাচ দিয়েছি!'

সুধীর সেন ঢাকার ছেলে। খাঁটি দেশের ভাষায় বলতে লাগল, 'কবে যে বিয়া করছিলাম, মনেও পড়ে না। দুই তিন সেঞ্চুরি হইয়া গেল বোধ হয়। বিজন হালারে দেইখা আরেকখান বিয়ার সাধ হইতাছে।'

বিজলী চোখের তারায় সুধীরকে বিঁধতে বিঁধতে বলল, 'খুব ভাল কথা। লতিকাকে বলে সাধ মেটাবার ব্যবস্থা করছি।'

নিখিল কিছুই বলে নি। সে শুধু ক্যামেরাটা তুলে নিয়ে ফ্ল্যাশ-লাইটে একের পর এক আমাদের ফটো তুলে যেতে লাগল।

শেষ ফটোটা যখন তোলা হয়েছে সেই সময় আমার চোখ সামনের দেয়াল ঘড়িটায় আটকে গেল। এখন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে সাতটা। এতক্ষণ গল্পে, গল্পে, ঠাট্টায় এবং বগড়ে বাড়ির কথা মনে ছিল না। আবার আমি চঞ্চল হয়ে উঠলাম। বিজলীকে বললাম, 'অনেক রাত হয়ে গেল; এবার চলি।'

এমন অদ্ভুত কথা আগে আর কখনও যেন শোনে নি বিজলী। অনেকক্ষণ অবাক তাকিয়ে থাকল সে। তারপর বলল, 'সে কি।'

'আমরা সেই এক্সট্রিক সাউথে থাকি। এখান থেকে যেতে কম করে দু আড়াই ঘণ্টা লেগে যাবে। তার মানে প্রায় সাড়ে ন'টা দশটা হবে। যা দিনকাল, একা অতটা রাস্তা যাওয়া বুঝতেই পারছেন—'

'বাড়ি ফিরতেই হবে?'

'হ্যাঁ।'

'আজ না ফিরলে হয় না?'

'না-না; কিছু বলে আসি নি। না ফিরলে সবাই ভাববে।'

পলকহীন তাকিয়ে ছিল বিজলী। বলল, 'ঠিক আছে। আগে খেয়ে-টেয়ে নাও তো। তারপর বাড়ি ফিরতে দেওয়া হবে কিনা, বিবেচনা করে দেখব।'

খেতে গেলে আরো অর্ধ ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগে যাবে। বললাম, 'আজ থাক। আরেক দিন এসে ঠিক খেয়ে যাব।'

'আরেক দিনের কথা আরেক দিন ভাবা যাবে। আজ সারা দুপুর উনুনের ধারে বসে বসে যে এত রান্না-বান্না করলাম সেগুলোর কী হবে?'

বোঝা গেল, না খাইয়ে ছাড়বে না বিজলী। বাড়িতে বলা আছে বিয়ে বাড়ি যাচ্ছি। তার মানে আমার জন্য খাবার-দাবার কিছু থাকবে না। ওরা ধরেই নেবে আমি খেয়ে যাব। বিয়ে বাড়ি থেকে কে আর না খেয়ে ফেরে। বিজন আর আমি আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম, ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের অফিস থেকে বেরিয়ে একটা ভাল রেস্তোরাঁয় গিয়ে খেয়ে নেব। কিন্তু বিজলীদের বাড়ি এসে সব গোলমাল হয়ে গেল।

এখন যদি না খেয়ে চলে যাই, আজকের রাতটা নির্ঘাত উপোস দিয়ে কাটাতে হবে।

বিজলী ডাকল, 'এসো আমার সঙ্গে—' সুধীরের দিকে ফিরে বলল, 'আপনারাও আসুন।'

রান্নাঘরের পাশেই চমৎকার খাবার ঘর। প্রকাণ্ড একটা টেবলের দু'ধারে আট দশখানা গদীওলা চেয়ার সুন্দর করে সাজানো।

বিজলী আমার হাত ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। বিজনকে বলল, 'বকুলের পাশে বসুন।'

বিজন গাঁইগুঁই করতে যাচ্ছিল ; বিজলী ধমকে উঠল, 'বসুন তো। আজ বউয়ের পাশে বসে খেতে হয়।'

বিজন বলল, 'নিয়ম নাকি ?'

বিজলী হেসে হেসে বলল, 'নিয়মই তো।'

'বেশ, নিয়মরক্ষাই তা হলে করা যাক—' ঝুম করে আমার পাশে বসে পড়ল বিজন। সুধাময়রাও বসে পড়েছিল।

এবার গাছকোমর বেঁধে পরিবেশন শুরু করল বিজলী। খুকু আর রুবি এটা সেটা হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে তাকে সাহায্য করতে লাগল। প্রচুর আয়োজন করেছে বিজলী। চার রকমের মাছ, ফ্রায়েড রাইস, মাটন চিকেন দুরকমের মাংস, আনারসের চাটনি, দই, সন্দেশ, রসগোল্লা। হৈ-চৈ করে খাওয়া চলতে লাগল।

খেতে খেতে ভাবলাম, এখান থেকে আর বাস-টাস ধরব না, একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা রাসবিহারী এ্যাভেনিউর মোড়ে চলে যাব। সেখান থেকে বাসে উঠব। যে সময়টা খাওয়ার পেছনে নষ্ট হবে ট্যাক্সি করে সেটা মেক-আপ করা যাবে। অবশ্য এই মাসের শেষে সাত-আটটা টাকা ট্যাক্সিভাড়া দেওয়া আমার মতো মেয়ের পক্ষে খুবই কষ্টের ব্যাপার কিন্তু কি আর করা যাবে!

খাওয়ার পর বিজনরা বাইরের ঘরে চলে গেল। আমি খাবার ঘরেই থেকে গেলাম। বিজলীকে বললাম, 'এবার কিন্তু আমাকে ছেড়ে দিতে হবে ভাই—'

বিজলী চোখ কুঁচকে একটু হাসল শুধু ; কিছু বলল না।

আমি আবার বললাম, 'আমাকে একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে দিন।'

বিজলী ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, 'এটা কি রকম হল ? আমি তোমাকে 'তুমি' করে বলছি। আর তুমি কিনা 'আপনি' চালিয়ে যাচ্ছ ! শর্ত ভঙ্গ হচ্ছে কিন্তু—'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি করেই বলছি। একটা ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে দাও ভাই।'

আমার গালটা জোরে টিপে দিয়ে বিজলী বলল, 'তুমি তো আচ্ছা মেয়ে—'

তার বলার ধরনে এমন কিছু আছে যাতে অবাক হলাম, 'কেন, কী করেছি!'

'বিয়ের দিনে খালি পালাই পালাই—'

'আমার অবস্থা তো জানো না।'

'জানতে চাই না। আজ তোমাকে ছাড়া হবে না।'

চমকে উঠলাম, 'কিন্তু আমাদের বাড়ি—'

বিজলী বলল, 'বাড়ির কথা আজ না ভাবলেও চলবে। রাতটা এখানেই বন্দী থাকবে। তোমাকে নিয়ে কী করা যায়, কাল ভেবে দেখব।

এ রকম একটা ফাঁদে পড়তে হবে জানলে কে এখানে আসত করুণ মুখ করে বলতে লাগলাম, 'আজ না ফিরলে বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে কী—'

'চুপ—' আমাকে মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে বিজলী বলল, 'আর একটা কথাও না।' বলেই আমাকে টানতে টানতে দক্ষিণ দিকের সেই বন্ধ ঘরটার সামনে নিয়ে এল। তারপর শেকল খুলে যেই বোতাম টিপে আলো জ্বালল অমনি আমার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে হাজার হাজার ঢেউ উঠতে লাগল।

ঘরের ঠিক মাঝ-মধ্যিখানে ডাবল-বেড নতুন খাট; তাতে নরম নিভাঁজ বিছানা। হলুদ সিল্কের চাদরের ওপর নানা রঙের চমৎকার চমৎকার নক্শা। পাশাপাশি দুটো বালিশ পাতা ছিল; সেগুলোর ওয়াড়ে সুন্দর কাজ-করা। জোড়া পরী, প্রজাপতি—এমনি কত কী ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার মতো এখন মনের অবস্থা নয়!

সব চাইতে যা বেশি করে চোখে পড়ে তা হল ফুল। গোটা বিছানাটা জুড়ে জুঁই, রজনীগন্ধা, বেল ছড়ানো রয়েছে। ছত্রিগুলো দেখা যায় না; ফুলের মালা দিয়ে সেগুলো জড়ানো।

সমস্ত ঘরটায় যেন ফুলের হাট বসানো। সুন্দর গন্ধে আমার মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করছে।

এই ঘরটা তখন আমাকে দেখায় নি বিজলী। কেন দেখায় নি, এখন যেন অল্প অল্প বুঝতে পারছি, বাতাসে একটা চক্রান্তের আভাসও পাওয়া যাচ্ছে। ঝাপসা গলায় বললাম, 'এখানে কী ?'

আমার নাক ধরে নাড়তে নাড়তে ঠোঁট ছুঁচলো করে বিজলী বলল, 'ন্যাকা—'

আমি দ্রুত চোখ নামিয়ে নিলাম।

বিজলী চারিদিক একবার দেখে নিয়ে বলল, 'এ ঘরে আজ তোমার ফুলশয্যা। বরের কাছে শুতে হবে, বুঝলে ?'

আমার গায়ে তক্ষুণি কাঁটা দিল। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কি বলবার জন্য চোখ তুলে দেখি বিজলী নেই ; কখন বেরিয়ে গেছে।

একটু পর বিজলী ফিরে এল। সঙ্গে বিজনরা।

বিজলী বিজনকে লক্ষ্য করে বলল, 'দেখুন, ঘরটা পছন্দ হয় কিনা—'

বিমূঢ়ের মতো মুখ করে বিজন বলল, 'মানে ?'

'এরা দুজনেই দেখছি ন্যাকা ; ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না।' কৌতুকের গলায় বিজলী বলতে লাগল, 'নতুন বউ নিয়ে একটা রাত কাটাবার পক্ষে ঘরটা কি খুব খারাপ হবে ?'

সুধীর সারা ঘরে এক চক্কোর ঘুরে এসে বলল, 'এতক্ষণে হালায় বিয়া বিয়া মনে হইতে আছে। কিন্তু এইটা কি রকম হইল বৌদি ?'

'কোনটা ?' বিজলী সুধীরের দিকে তাকাল।

'এই একদিনেই বিয়া আর ফুলশয্যা—'

'কি আর করা যাবে। এই বিয়েতে এ রকম ফুলশয্যাই হয়।'

'সব মেড-ইজি ব্যাপার।'

'যা বলেছেন !'

বিজন জলে-ডোবা মানুষের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিল। ফাঁক পেয়ে বলল, 'এর কোন মানে হয়। আমাদের ফিরতে হবে—'

বিজলী প্রায় ধমকেই উঠল 'বেশি ওস্তাদি করবেন না মশাই—' বলেই সুধাময়দের নিয়ে বেরিয়ে গেল এবং বাইরে থেকে তক্ষুণি দরজা বন্ধ করে দিল।

এখন এ ঘরে বিজন আর আমি ছাড়া কেউ নেই। বিজন একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরময় হেঁটে বেড়াচ্ছিল। আমি বিছানার এককোণে জড়সড় বসে আছি।

এই মুহূর্তটাকে নিয়ে সব মেয়েই মনে মনে স্বপ্ন দেখে। আমিও দেখেছিলাম। কিন্তু এক আচমকা বিজলী আমাকে আর বিজনকে যে ফুলের মেলায় ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেবে ভাবতে পারি নি। এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।

ঘরময় ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ ঝপ করে আমার পাশে বসে পড়ল বিজন। বলল, 'কি ঝামেলায় পড়া গেল বল তো। বাড়ি না ফিরলেই নয়। মা'র সেই সিম্পটমটা আজ আবার দেখা দিয়েছে।'

বিজনের বিধবা মা পাগল। মাঝে মাঝে বেশ ভাল থাকে। তারপর হঠাৎ একদিন গণ্ডগোল দেখা দেয়। তখন তাকে নিয়ে ভারি বিপদে পড়ে বিজনরা।

ভাল দিনেই আমাদের বিয়ে হল। বললাম, 'মাঝখানে তো অনেকদিন ভাল ছিলেন।'

'হ্যাঁ, বছরখানেকের মতো। একসঙ্গে এতদিন মা আর কখনও ভাল থাকে নি।'

আমি চুপ করে রইলাম।

বিজন বলল, 'ভেবেছিলাম মা বোধহয় একেবারে ভাল হয়ে গেল কিন্তু...' তার মুখে বিষাদের ছায়া পড়ল।

বললাম, 'হঠাৎ আবার এ রকম হল যে?'

বিজন ক্লান্তভাবে হাসল, 'না হওয়াটাই তো আশ্চর্যের ব্যাপার। আমাদের সংসারটা কী, তুমি তো জানো। তার মধ্যে মা একটা বছর কি করে যে ভাল থাকল!'

বিজন তাদের বাড়ির সব কথাই আমাকে বলেছে। দু'একবার সেখানে নিয়েও গেছে। ওদের সংসারে সবসময় যেন একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটে আছে। বিজনের মা, বিধবা দিদি, ডাইভোর্স-হওয়া বোন, ভাগনে-ভাগনীরা—যখনই ওদের বাড়ি যাওয়া যাক, দেখা যাবে, কেউ না কেউ

গলা ফাটিয়ে ঝগড়া করে যাচ্ছে। বিজন বলে, 'আমাদের বাড়িটা একটা ব্যাটল-ফিল্ড। ওয়ার্ল্ডের সব লড়াই একদিন না একদিন থামে, কিন্তু এ লড়াই থামবার নয়।'

যাই হোক আমি কিছু বললাম না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

বিজন দুরমনস্কের মতো সিগারেট খেতে লাগল। সেটা ফুরিয়ে এলে টোকা দিয়ে জানালার বাইরে ছুঁড়ে হঠাৎ আমার কাঁধে একখানা হাত রাখল।

বিজন এর আগেও অনেকবার আমাকে ছুঁয়েছে, কাঁধে-ঘাড়ে-গলায় হাত রেখেছে। সুযোগ-টুযোগ পেলে দু-একটা চুমুও খেয়েছে। তবু অসাবধানে ইলেকট্রিকের তারে ছোঁয়া লাগার মতো আমার রক্তের ভেতর ঝন ঝন করে কি যেন ভাঙতে লাগল। পরক্ষণেই শরীরটা দারুণ অবশ হয়ে গেল

লক্ষ করলাম, বিজনের চোখ ধীরে ধীরে অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। কেমন যেন স্থির, মুগ্ধ। পাতলা কুয়াশার মতো সেখানে কি জমছে।

বিজন অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তার আরেকটা হাতও কখন আমার কাঁধে উঠে এসেছিল। আমাকে বেষ্টন করে বিজন তার বুকের ভেতর টেনে নিল।

আইনত বিজন আমার স্বামী। ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের খাতায় পাশাপাশি সই দিয়ে কিছুক্ষণ আগে আমরা স্বামী-স্ত্রী হয়েছি। তবু বিজনের বুকের ভেতর আমার ভীষণ ভয় করছে। চুরি করে অন্যায় ভাবে আমি যেন নিষিদ্ধ খেলায় মাততে চলেছি।

আমাদের এই বিয়েটা আইনের দিক থেকে নিখুঁত, তবু আমার দ্বিধা কিছুতেই কাটছে না। শাঁখ-টাঁখ বাজিয়ে, পুরুত ডেকে, অগ্নিসাক্ষী করে আত্মীয়-স্বজনদের সামনে যদি আমার বিয়ে হত, বিজনের সঙ্গে এক ঘরে ঢুকে অনায়াসেই দরজায় খিল লাগাতে পারতাম। লজ্জা নিশ্চয়ই করত কিন্তু এমন ভয় লাগত না। আমার মধ্যে সংস্কার-ভীরু একটা মেয়ে আছে, সে বড় অবুঝ।

বিজন চাপা গলায় বলল, 'বিজলী বৌদি যা কাণ্ড করল, আজ আর যাওয়া যাবে না বোধহয়।'

আমি উত্তর দিলাম না।

বিজন আবার বলল, 'দশ বছর লাগল বিয়ে করতে। ফুলশয্যা হতে আরো ক'বছর লেগে যেত, কে জানে। এ একরকম ভালই হল। কাজ যতটা এগিয়ে রাখা যায়।' বিজন হাসতে লাগল।

আমি হাসলাম না। খুব আস্তে করে বললাম ; হয়তো আমাব সেই ভয়টাই বলিয়ে দিল, 'বাড়ি ফিরব।'

বিজন ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল। বলল, 'আজ না হয় না-ই গেলে। মোটে একটা তো রাত—'

'বাড়িতে খুব চিন্তা করবে—'

বিজন আর কিছু বলল না ; আমাকে আরেকটু কাছে টানল। তার বুকেব ভেতর মিশে যেতে যেতে অনুভব করলাম, আমার হৃৎপিণ্ড ভীষণ লাফাচ্ছে। তার মধ্যেই বিজনের মুখ আমার ঠোঁটে নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য আগুনের হল্কা আমার শরীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কে জানত, তিরিশ বছর বয়েসেও এ দেহ মশাল হয়ে উঠতে পারে। আমাব ভয়, সংস্কাব ক্রমশঃ মুছে যেতে লাগল। নিজেব অজান্তেই দু'হাতে বিজনকে জড়িয়ে ধরলাম।

আর ঠিক সেই সময় কাচের বাসন ভাঙার মতো শব্দ করে বাইবে বিজলী হেসে উঠল। হাসতে হাসতে জড়ানো স্বরে বলল, 'বিজন ঠাকুরপো, একটু রেখে ঢেকে। একদিনেই মেয়েটাকে খেয়ে ফেলবেন না।'

'শক' খাওয়ার মতো বিজন এবং আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে দু'দিকে ছিটকে গেলাম। আর তখনই সেই ভয়টা আবার আমাকে তার মুঠোর ভেতর পেয়ে গেল।

ওদিকে বিব্রতভাবে কয়েক পলক দাঁড়িয়ে থাকল বিজন। তারপর গলা তুলে বিজলীকে ডাকল, 'বৌদি—বৌদি—'

কিচেনের ওধার থেকে বিজলীর গলা ভেসে এল, 'আমি চলে যাচ্ছি ভাই। আর আপনাদের ডিসটার্ব করব না। সুখের পানসী চালিয়ে যান।'

বিজনকে কিছুটা দ্বিধান্বিতের মতো দেখাল। তার পরেই সে আমার দিকে ফিরল। হেসে হেসে বলল, 'সুধাময়ের বউটা যাচ্ছেতাই।'

আমি যেন বিজনের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম না। ফস করে আবার বলে ফেললাম, 'আমি বাড়ি যাব।'

'তখন থেকে শুধু 'বাড়ি যাব বাড়ি যাব' করে যাচ্ছ। কি এমন কাজ বাড়িতে ?'

'তখনই তো বললাম, না গেলে সবাই ভাববে। তাছাড়া—'

'কী ?'

'আমার খুব ভয় করছে।'

মুহূর্তে বিজনের মুখ কালো হয়ে গেল, 'ভয় ! আমাকে ?'

উত্তর দিলাম না ; মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

বিজন একটুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর ভারী শিথিল গলায় বলল, 'চল তবে—'

চকিতে একবার মুখ তুললাম। বিজনকে অত্যন্ত হতাশ আর করুণ দেখাচ্ছে, আমার ভীষণ কষ্ট হতে লাগল। কিন্তু নিজের মধ্যেকার ভয় আর সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি কোথাও খুঁজে পেলাম না।

বিজলী এ ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে দিয়ে গিয়েছিল ; শেকল-টেকল কিছু ছায় নি। বিজন গিয়ে টানতেই দরজাটা খুলে গেল।

সাজানো ফুলের মেলা ছেড়ে একটু পর আমরা সুধাময়দের বাইরের ঘরে চলে এলাম। বিজলী, সুধাময়, রুবি আর খুকু চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে গল্প করছিল। সুধীরদের দেখতে পেলাম না। নিশ্চয়ই চলে গেছে। যাবার আগে আমাদের আর বিরক্ত করে নি।

বিজন আর আমাকে দেখে বিজলীরা অবাক। অনেকক্ষণ তাদের চোখে পলক পড়ল না ! তারপর বিজলীই প্রথম লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'কী ব্যাপার, তোমরা !'

আমি উত্তর দেবার আগেই বিজন বলল, 'হ্যাঁ আমরা !'

বিজলী বলল, 'চলে এলেন যে !'

'বা বে, বাড়ি ফিরতে হবে না?'

'তার মানে!'

'মানে খুব সহজ। বাড়ি না গিয়ে উপায় নেই।' বিজন হাসতে লাগল!

বিজলী খুব দ্রুত একবার আমাকে, আরেকবার বিজনকে দেখে নিয়ে নিচু গলায় বলল, 'এই তো দু'জনকে ওঘরে রেখে এলাম। এর মধ্যে কী এমন হল। ঝগড়া করেছেন নাকি?'

'কি আশ্চর্য, নতুন বউয়ের সঙ্গে কেউ বিয়ের দিনে ঝগড়া করে? বকুলকে জিজ্ঞেস করুন না।' বিজলীর প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে আমার দিকে ফিরল বিজন, 'এ্যাই, তুমিই বল না—'

লক্ষ্য করলাম, একটু আগে ওঘরে যা হয়ে গেছে, বিজনের মুখে-চোখে তার এতটুকু দাগ নেই হেসে হেসে সে সব উড়িয়ে দিচ্ছে। যাই হোক, আমি কিছু বললাম না।

বিজলী বলল, 'কি জানি বাবা, আপনাদের কিছুই বুঝি না।'

সুধাময় এতক্ষণে মুখ খুলল, 'সত্যি সত্যি যাবি?' বিজনের কথা সবটা সে যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না।

বিজন বলল, 'হ্যাঁ রে, যেতেই হবে।'

সুধাময় বলল, 'তোরা একের রে থার্ড ক্লাস। এর কোন মানে হয়।'

বিজলী বলল, 'শুধু শুধু কাঁড়ি কাঁড়ি ফুল কেনা হল। অতগুলো টাকাই গচ্চা।' তাকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ দেখাচ্ছে।

বিজন মুখ কাচুমাচু করে বলল, 'রাগ করবেন না বৌদি। ফুলে ফুলে ঘর সাজিয়ে আমাদের ঢুকিয়ে দিলে কি হবে। কপালে নেই।'

'আমাদের আনন্দ-টানন্দ বলে একটা কথা আছে। ইচ্ছে করলেই আজকের রাতটা থেকে যেতে পারতেন।'

বিজন উত্তর দিল না।

কিছুক্ষণ পর আমরা বেরিয়ে পড়লাম। বিজলী সদর দরজা পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এল। সুধাময় এল রাস্তার মোড় পর্যন্ত। আমাদের একটা ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে সে ফিরে গেল

ট্যাক্সিওলা ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাব?'

বিজন আমাকে বলল, 'তোমাকে কি বাড়িতে দিয়ে আসতে হবে?'

মুখ নামিয়ে আধফোটা গলায় বললাম, 'না। এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত গেলেই হবে। আমি ওখান থেকে বাস ধরব।'

বিজন ট্যাক্সিওলাকে বলল, 'এসপ্ল্যানেড তো চলুন, তারপর দেখা যাবে।'

ট্যাক্সি চলতে শুরু করল।

আমরা পাশাপাশি বসে আছি ঠিকই কিন্তু কেউ যেন কারোকে চিনি না। বিজনের মুখ জানালার বাইরে ফেরানো। আমি নতচোখে আঙুলে শাড়ির আঁচলটা জড়াচ্ছি, তক্ষুণি খুলে ফেলছি। আবার জড়াচ্ছি। বিজনের দিকে তাকাতে সাহস হচ্ছিল না। ওর জন্য আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। আজকের দিনে বিজনকে দুঃখ দিলাম, এই ভাবনাটা ঘুণপোকার মতো আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। কিন্তু কী করব? আমি যে বড় ভীরু, বড় দুর্বল।

দু'ধারের বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট, রাস্তার আলো, দ্রুত সরে সরে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত মুখ তুলতে পারলাম। বিজন অন্যমনস্কের মতো এখনও বাইরে তাকিয়ে আছে।

এখন শরৎকাল : রুপোর থালার মতো গোল একখানা চাঁদ উঁচু উঁচু বাড়ির মাথা ডিঙিয়ে আকাশের মাঝ-মধ্যিখানে উঠে এসেছে। অমল জ্যোৎস্নায় চারদিক ভেসে যাচ্ছে।

দু তিনবার চেষ্টার পর আমার গলায় স্বর ফুটল। ভয়ে ভয়ে ডাকলাম, 'এই—'

বিজন মুখ ফেরাল না। বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে বলল, 'কী বলছ?'

সামনের আয়নায় ট্যাক্সিওলা হয়তো আমাকে দেখতে পাচ্ছে তবু বিজনের দিকে অনেকখানি সরে গিয়ে বললাম, 'রাগ করেছ?'

'না, রাগ কিসের—?'

'করেছ ; আবার বলছ কিসের। আমি যেন কিছু বুঝি না।'

'বোঝো নাকি!' বিজন এতক্ষণে আমার দিকে তাকাল, 'আজকের রাতটা থেকে গেলে কি এমন ক্ষতি হয়ে যেত। সুধাময়রা খুব অসন্তুষ্ট হয়েছে।'

উত্তর দিলাম না।

বিজন আবার বলল, 'কি, চুপ করে আছ যে?'

'কী বলব? তুমি তো আমাকে জানো—'

এক পলক কি ভেবে বিজন চাপা ক্ষোভের গলায় বলল, 'শুধু ভয়, ভয় আর ভয়—'

তার একটা হাত ধরে বললাম, 'আমার অন্যায় হয়ে গেছে। ক্ষমা কর—ক্ষমা কর—' আমার কণ্ঠস্বর কাঁপছিল, চোখ জলে ভরে যাচ্ছিল!

বিজন হাত ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলল, 'ঐ ছাখো, শুধু শুধু কাঁদছে।' আমাকে তার দিকে টেনে নিয়ে আদরের গলায় বলল, 'কি বোকা মেয়ে!' বলতে বলতে হেসে ফেলল।

বিজন যেন শরৎকালের মেঘ, বেশিক্ষণ মুখ ভার করে থাকতে পারে না। একটু পরেই উজ্জ্বল রোদের মতো ঝলমলিয়ে ওঠে।

একসময় আমরা এসপ্ল্যানেড এসে গেলাম। ট্যাক্সিওলাআবার পেছনে তাকাল, 'এখানেই নামবেন?'

হাতঘড়ি দেখে বিজন চমকে উঠল। আমাকে বলল, 'আরে বাবা, ন'টা বেজে গেছে। এখানে নেমে আর দরকার নেই ; চলো তোমাকে আরেকটু এগিয়ে দিয়ে আসি—' ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলল, 'রাসবিহারীর মোড় চলুন—'

যেতে যেতে বিজন বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে। মনে থাকতে থাকতে বলে নিই।'

'কী কথা?'

'বিয়েটা যখন হয়েই গেল, বেশিদিন আলাদা থাকার মানে হয় না!'

আমি চুপ।

বিজন বলতে লাগল, 'লাইফের অর্ধেক পার করে ফেললাম।

এবার নিজেদের কথা একটু ভাবতে হবে। দু-একদিনের ভেতর বিয়েব কথা বাড়িতে বলব। তুমিও বোলো '

ভয় পেয়ে গেলাম, 'বাড়িতে বলব !'

'না বলবার কী আছে। আমরা কি চুরি করেছি ?' বিজনকে উত্তেজিত মনে হল, 'অন্যের বোঝা বয়ে বয়ে কত দিন আর বেড়াব।'

আমি জানি বিজনের এই উত্তেজনা অল্পক্ষণের। সে বা আমি যেখানে আছি খুব সহজে সেখান থেকে বেবিয়ে আসতে পারব না। বাইরে বিজনের সঙ্গে যখন দেখা হয়, আমরা অনেক কথা বলি, অনেক রকম দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত নিই, কিন্তু যেই বাড়ি ফিরে আসি মনে হয় একটা ফাঁদে আটকে গেলাম। আমাদের নিজেদের মধ্যেই কোথায় যেন একটা পিঞ্জর আছে, সেটা ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারি না।

বিজনের উত্তেজনা আলতোভাবে আমাকে ছুঁয়ে গিয়েছিল। বললাম, 'হ্যাঁ, বাড়িতে বলতে হবে।'

বিজন বলল, 'বাড়িব একটা ব্যবস্থা করে ভাবছি গভর্ণমেন্ট হাউসিং স্কীমের ফ্ল্যাট নেব। তুমি কি বল ?'

এই পরিকল্পনাটা আমাদের অনেকদিনের। বিয়ের পর গভর্ণমেন্ট স্কীমের ফ্ল্যাট নেব, কতবার এ নিয়ে আমরা স্বপ্ন দেখেছি। বললাম, 'খুব ভাল হবে।'

'বাড়িতে আলটিমেটাম দাও। বোলো দু'মাসের মধ্যে যে যার ব্যবস্থা করে নাও ; তারপর একদিনও আমি থাকছি না।'

'আচ্ছা —'

ট্যাক্সির চাকার তলা দিয়ে এ্যাসফাল্ট-দেওয়া মসৃণ রাস্তা সট সট বেরিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যেতে বিব্রতভাবে বললাম, 'এই, একটা কথা বলব, কিছু মনে করবে না তো ?'

'কী ?'

'এই দ্যাখো না, বিজলীদি এন্তার সিঁদুর লাগিয়ে দিয়েছে। এ সব নিয়ে কি করে বাড়ি ফিরব !'

ভালোমানুষের মতো মুখ করে বিজন বলল, 'কী করতে চাও ?'

'তুমিই বল না কী করব।'

'আমি কী বলব! কী করলে তোমার সুবিধে হবে, তুমিই জানো—'

ট্যাক্সির ভেতরকার আবছা অন্ধকারে বিজনের চোখের ভেতর তাকিয়েই মুখ ফেরাতে হল। ও কী ভাববে, বুঝতে পারছি না। ভীরু শিথিল স্বরে তবু বললাম, 'সিঁদুরটা না মুছে গেলে—'

বিজন প্রায় আঁৎকে উঠল। চাপা গলায় বলল, 'কী সর্বনাশ!'

চমকে উঠলাম, 'কী হল!'

'সিঁদুর মুছলে আমার কী হবে? বিয়ের দিনেই চাও আমি দেহরক্ষা করি—'

মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে হিম নেমে গেল। বললাম, 'কী যা-তা বলছ!'

আমার নাকে আস্তে আস্তে টোকা দিয়ে বিজন ঠোঁট ছুঁচলো করল। বলল, 'কুসংস্কারের ডিপো একটি। সিঁদুর মুছেই বাড়ি যেও—'

'সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ রে বাবা, হ্যাঁ।'

রুমাল বার করে ঘষে ঘষে সিঁদুর তুলতে লাগলাম। আরো খানিকক্ষণ পর রাসবিহারীর মোড়ে আমাকে নামিয়ে দিয়ে বিজন চলে গেল।

অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে রাসবিহারীর মোড় থেকে শহরতলীর বাসে উঠলাম। তারপর আধঘণ্টাও লাগল না বাসটা নির্দিষ্ট স্টপেজে আমাকে পৌঁছে দিয়ে হুস করে বেরিয়ে গেল।

রাস্তায় নেমে আলো-টালো চোখে পড়ল না। চারদিকে অন্ধকার।

আজও বোধ হয় ইলেকট্রিক সাপ্লাইতে কোন গণ্ডগোল হয়েছে। ইদানীং আমাদের এদিকটায় প্রায়ই লাইট নিভে যাচ্ছে। তিন ঘণ্টা, চার ঘণ্টা, কোন কোন দিন সারারাতই অন্ধকারে থাকতে হয়। এ একেবারে নিয়মিত এবং দৈনন্দিন।

মোড়ের দোকান-টোকানগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তায় লোকজন নেই। শুধু 'ভূপতি কেবিন' আর হরেনের পান-বিড়ির দোকানটা এখনও খোলা। ওরা টিমটিমে হেরিকেন ঝুলিয়ে রেখেছে সামনে। হরেনের দোকানে হরেন ছাড়া আর কেউ নেই।

হেরিকেনের আলোয় ঝুঁকে নোট আর রেজগি গুনে থাক থাক করে রাখছিল হরেন। খুব সম্ভব সারাদিনের বেচাকেনার হিসেব করছে। 'ভূপতি কেবিনে' কিন্তু কয়েকজনকে দেখা গেল। দূর থেকে হেরিকেনের আলোয় ওদের চিনতে অবশ্য পারলাম না। তবে জানি সারা রাত খোলা থাকলেও 'ভূপতি কেবিনে' খদ্দেরের অভাব হবে না। চা-বিস্কুট-কেক-পোচ-অমলেট সামনের দিকে বিক্রি হয় কিন্তু পেছনে ছোট্ট একটা ঘর আছে। সেখানে সারা দিনরাত জুয়ার আড্ডা চলে। পুলিশ কতবার যে হানা দিয়েছে, তার ঠিক নেই। 'ভূপতি কেবিনের' মালিক ভূপতি তালুকদারকে তিন চার বার থানায় ধরেও নিয়ে গেছে, কিন্তু জুয়া বন্ধ করা যায় নি।

এখান থেকে মিনিট কয়েক হাঁটলে তবে আমাদের বাড়ি। এই রাতেরবেলা অন্ধকার ফাঁকা রাস্তায় একা একা যেতে সাহস হল না। ডান দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল বড় পাকুড় গাছটার তলায় রিক্শা-স্ট্যাণ্ড। এখনও দু-তিনটে সাইকেল রিক্শা মিটমিটে বাতি জ্বালিয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।

একটা রিক্শা ডেকে উঠে পড়লাম। বড় রাস্তা থেকে রিক্শাটা যখন আমাদের খোয়া-ওঠা গলিতে ঢুকতে যাচ্ছে সেইসময় কে ডাকল, 'এই দিদি—এই—'

চমকে পেছনে ফিরতেই দেখি, বড় রাস্তার ওপার থেকে ছুটতে ছুটতে গণেশ আসছে।

কুড়ি একুশ বছর বয়েস গণেশের। গায়ের রং কালো, গাঁট্টাগোট্টা পেটানো শরীর, লম্বা ধাঁচের মুখ, চওড়া শক্ত কাঁধ—সব মিলিয়ে একটা বেপরোয়া একরোখা ভাব আছে তার চেহারায়। কিন্তু ভাসাভাসা চোখদুটো ভারি সরল। সমস্ত কিছুর মধ্যেও কোথায় যেন একটা ছেলেমানুষি তার মধ্যে থেকে গেছে।

এই মুহূর্তে তার পরনে চাপা ট্রাউজার্স আর বুকখোলা শার্ট, পায়ে চপ্পল। এলোমেলো চুল হাওয়ায় উড়ছে।

একমুখ হেসে গণেশ বলল, 'দূর থেকে তোকে দেখেই ঠিক চিনতে পেরেছি। নেমন্তন্ন খেয়ে এই ফিরলি বুঝি ?'

আমার বিয়ে বাড়ি যাবার খবর গণেশ জানে। জড়ানো গলায় বললাম, 'হ্যাঁ।'

'চল্ ; তোর সঙ্গে বাড়ি যাই--' বলেই লাফ দিয়ে রিক্শায় উঠে আমার পাশে বসে পড়ল গণেশ।

'এত রাত্তিরে এখানে কী করছিলি ?'

'ভূপতি কেবিনে বসে—' বলেই আচমকা থেমে গিয়ে মুখ নিচু করে ঘাড় চুলকোতে লাগল গণেশ।

ও জানে চায়ের দোকানে আড্ডা দেওয়া আমার দু'চোখের বিষ। বললাম, 'তোকে না কতবার বারণ করেছি ওখানে যাবি না—'

'এই লাস্ট দিদি ; তুই দেখে নিস। তোর পায়ে ধরে বলছি -' ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে সত্যি সত্যিই ঝুঁকে আমার পা ছুঁল গণেশ।

এত ছেলেমানুষ গণেশটা ; ওর ওপর রাগ করে থাকবে কে ? আমি হেসে ফেললাম, 'ঠিক বলছিস, এই লাস্ট তো ?'

'তোর পা ছুঁয়ে আমি কি মিথ্যে বলছি !'

আমি জানি এই প্রতিজ্ঞার কথা কাল সকালেই আর মনে থাকবে না ওর। আগেও অনেকবার কথা দিয়ে কথা রাখে নি গণেশ। 'ভূপতি কেবিনে'র আকর্ষণ এমন যে তা ঠেকাবার সাধ্য গণেশের নেই।

রিক্শা চলতে শুরু করেছিল। অন্য দিন দু' ধারের বাড়িগুলো থেকে একটু-আধটু আলো রাস্তায় এসে পড়ে ; আজ কিছু নেই। শুধু

শরতের জ্যোৎস্নায় চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

বললাম, 'আজ কখন লাইট গেছে রে?'

গণেশ বলল, 'সন্ধ্যেবেলা। রোজ রোজ এই এক ঝামেলা হয়েছে। ভাবছি পাড়ার লোক জুটিয়ে কাল একবার ইলেকট্রিক অফিসে যাব। এর একটা ফয়সালা হওয়া দরকার।' তাকে খুব বিরক্ত দেখাচ্ছে।

একটু থেমে গণেশ আবার বলল, 'ওরাই বা কী করবে? চারদিকে যা শালা তার-ফার চুরি হচ্ছে। লাইফ পটাসিয়াম হয়ে গেল।' বলতে বলতেই আমার দিকে মুখ ফেরাল, 'কী সেন্ট মেখেছিস রে দিদি, ফাইন গন্ধ বেরুচ্ছে—'

বিজলী আমার গায়ে একটা সেন্টের শিশি ঢেলে দিয়েছিল। গন্ধটা উগ্র হলেও খুব সুন্দর। বললাম, 'নাম জানি না; বিয়ে বাড়িতে আমার এক বন্ধু লাগিয়ে দিল।'

আমার কথা শেষ হল কি হল না, তার আগেই চেঁচিয়ে উঠল গণেশ, 'এ কি রে দিদি—'

চমকে গেলাম, 'কী?'

একদৃষ্টে আমাকে দেখতে দেখতে গণেশ বলল, 'দারুণ মাঞ্জা চড়িয়েছিস তো—'

আজকালকার ছেলে ছোকরারা অদ্ভুত অদ্ভুত ইডিয়মে কথা বলে। মাঞ্জা চড়ানোর মানে আমি বুঝি। তাই গণেশের চোখে চোখ রাখতে পারছিলাম না। লজ্জায় এতটুকু হয়ে যেতে যেতে বললাম, 'কী যে বলিস—'

'ঠিকই বলছি রে দিদিভাই। যা সেজেছিস না, তাতে কী মনে হচ্ছে জানিস?'

'কী?'

'বিয়েটা বোধ হয় তোর বন্ধুর ছিল না।'

নিশ্বাস বন্ধ করে বললাম, 'তবে কার ছিল?'

গণেশ হাসতে হাসতে মজার মুখ করে বলল, 'তোর।'

গণেশ রগড় করে বলেছে বটে, তবু আমার বুকের ভেতর দিয়ে

বিদ্যুৎ চমকানির মতো খুব দ্রুত কি খেলে গেল।

আমার সাজগোজ নিয়ে আর মাথা ঘামাল না গণেশ। বলল, 'তোর কোন্ বন্ধুর বিয়ে ছিল রে দিদি ?'

'অফিসের এক বন্ধুর।'

'কার ? কনকদির ?'

'না।'

'পূর্ণিমাদির ?'

'না।'

'তবে কি সেই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েটা, স্টেলা না কি যেন নাম, তার ?'

'আরে না—'

'তা হলে কার ?'

যে কোন ব্যাপারেই গণেশের কৌতূহল-টৌতূহল খুব কম। কিন্তু আজ সে একেবারে বিরুদ্ধ পক্ষের উকিলের মতো জেরা শুরু করে দিয়েছে। আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। বললাম, 'তুই আমার সব বন্ধুকে চিনিস ?'

'বা রে, চিনি না ! কতবার তোর অফিসে গেছি। কনকদি, পূর্ণিমাদি, স্টেলা, কবরীদি, মানসীদি—নাম বলে যাব ?'

গণেশটা দারুণ ফাঁদে ফেলে দিয়েছে তো। চট করে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বললাম, 'হয়েছে হয়েছে, আর নাম করতে হবে না। তুই আমাদের সেকসানের মেয়েদের চিনিস। কিন্তু অতবড় অফিসটায় আরো তো সেকসান আছে। যার বিয়ে হল সে এস্টাব্লিশমেণ্টের।'

গণেশ তক্ষুনি মেনে নিল, 'ও, আচ্ছা—'

এতক্ষণে আমি সহজভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারলাম।

গণেশের সঙ্গে টুকরো-টুকরো এলোমেলো কথা বলতে বলতে একসময় আমরা বাড়ি পৌঁছে গেলাম। রিক্শাওলাকে ভাড়া মিটিয়ে ভেতরে যেতেই চোখে পড়ল, রান্নাঘরে মোমবাতি জ্বলছে।

বাবা খেতে বসেছিল ; একটু দুরে উঁচু ছোট একটা পিঁড়ির ওপর সৎ-মা বসে আছে।

বাবার বয়েস চৌষট্টির মতো ; তবে ম্যাট্রিকুলেশনের সার্টিফিকেটে বছর তিনেক কমানো আছে। অস্বাভাবিক ঢ্যাঙা চেহারা ; প্রায় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা। সেই তুলনায় গায়ে মাংস-টাংস নেই। খুব রোগা বলে এ পাড়ার ছেলে-ছোকরার দল বলে, 'লেংথ উইদাউট ব্রেড্থ্—' কেউ বলে, 'স্ট্রেট লাইন—' চৌকোণা মুখ, গোল চোখ দুটো কুয়োর ভেতর ঢোকানো। অপরিচ্ছন্ন মুখে গুচ্ছের কাঁচা পাকা দাড়ি পিনের মতো ফুটে আছে। বাবা যতক্ষণ বাড়ি থাকে একটা চেক-কাটা লুঙ্গি ছাড়া আর কিছু পরে না। গেঞ্জি-.টঞ্জির বালাই নেই। শীতকালে অবশ্য একটা ধুসো রোঁয়াওলা চাদরও গায়ে জড়ানো থাকে।

সৎ-মা'র বয়েস চুয়াল্লিশের কাছাকাছি। মুখখানা বয়েসের তুলনায় ঢের কচি। শুধু মুখটা যদি কেউ ছাখে, বলবে বাচ্চা মেয়ে। কিন্তু গায়ে প্রচুর চর্বি জমিয়ে এর মধ্যেই থলথলে হয়ে গেছে। মোটা বলে শীতকালটা ছাড়া অন্য সময় গায়ে জামা-টামা রাখতে পারে না। ভীষণ ঘামে সে ; কোনরকমে শাড়িব আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে রাখে।

টকটকে ফর্সা রং। বড় বড চোখ, ছোট্ট কপালের ওপর থেকে থাক থাক কোঁচকানো কোঁচকানো চুল। খোঁপা-টোপা খুলে চুল এলো করে দিলে এই বয়েসেও কোমর ছাপিয়ে পড়ে। হাতে একগাছা করে সোনা বাঁধানো লোহা, কানে পাতলা মাকড়ি, নাকে সবুজ পাথরবসানো নাকছাবি। মোটা হয়ে দেহের রেখাগুলো চর্বির তলায় ঢাকা না পড়লে সৎ-মাকে এক কথায় রূপসী বলা যেত।

কুড়ি বছরের বড় স্বামীর ঘর করতে হচ্ছে বলে সৎ-মা খুব অসন্তুষ্ট। তার বুকের ভেতর সব সময় ফার্ণেসের মতো কিছু একটা জ্বলছে ; কারণে অকারণে যে কোন ছুতোয় সে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে ছায়। সৎ-মা'র বিশ্বাস বাবার হাতে পড়ে তার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল।

পায়ের শব্দে বাবা মুখ ফেরাল, 'কে রে ?'

সাড়া দিলাম। গণেশ পাশ থেকে বলল, 'আমিও এসেছি মা।

খেতে দাও ; হাত-পা ধুয়ে আসছি।'

সৎ-মা বলল, 'এসো, শ্রাদ্ধের পিণ্ডি বাড়াই আছে।' ছেলেদের সঙ্গে এইভাবেই কথা বলে থাকে সে।

বাবা গণেশকে বলল, 'কয়টা বাজে হুঁস আছে?'

গণেশ উত্তর দিল না।

বাবা আবার বলল, 'এত রাইত পর্যন্ত বাইরে বাইরে করস কী?'

গণেশ বলল, 'আমার কাজ ছিল।'

বাবা ক্ষেপে উঠল, 'কী রাজকার্য শুনি? একটা পয়সা রোজগার করনের ক্ষ্যামতা নাই, তার আবার কাম! চায়ের দোকানে আড্ডা আর মস্তানি করা ছাড়া আর কোন কাম আছে তর! হারামজাদারা বাড়িটারে ধর্মশালা বানাইয়া তুলল!'

এসব প্রতিদিনের ব্যাপার। শুনতে শুনতে চামড়া দু' ইঞ্চি পুরু হয়ে গেছে গণেশের ; আজকাল আর গায়ে বেঁধে না। ব্যাপারটা যেন খুবই মজার ; গণেশ আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে হাসতে হাসতে উঠোনের শেষ মাথায় টিউবওয়েলটার কাছে চলে গেল।

বাবা সৎ-মাকে জিজ্ঞেস করল, 'সেই দুইটা বাড়িতে ঢুকছে?'

সেই দুটো অর্থাৎ বাচ্চু আর হাবু। সৎ-মা বিস্বাদ গলায় বলল, 'না। বারোটার আগে তারা বাড়িতে ঢোকে না।'

কথাটা ঠিকই। গণেশ তবু ন'টা দশটার ভেতর ফিরে আসে। কিন্তু মাঝরাত না হলে বাচ্চু হাবু ফেরার নাম করে না। ওদের খাবার ঢাকা দেওয়া থাকে। কখন ওরা আসে, কখন খায়, কেউ টেরও পায় না ; কেননা তার আগেই এ বাড়ি ঘুমের আরকে ডুবে যায়।

বাবা গজ গজ করতে লাগল, 'জুতার বাড়ি মাইরা শুয়োরের পালরে বাড়ি থনে বাইর কইরা দিমু।'

বেকার আড্ডাবাজ ছেলেদের তাড়িয়ে দেবার প্রতিজ্ঞাটা রোজ রাত্তিরে একবার করে নেয় বাবা ; পরের দিন সকালেই ভুলে যায়। কিন্তু রাত্তিরে গণেশদের ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখলে রক্ত মাথায় চড়ে যায় তার ; নতুন করে শপথটা আবার মনে পড়ে।

গজ গজ করতে করতে বাবা আমার দিকে তাকাল। গলাটা নরম কা্রে বলল, 'এত রাইত করলি যে বকুল—'

বাবা পার্টিসানের পরপরই সীমান্তের এপারে চলে এসেছে। কিন্তু এখনও তার কথায় ওপারের টান। বাবার বলার ধরন থেকে ঢাকা জেলার সেই গ্রাম্য গন্ধটা আর গেল না। আগে আগে বাবাকে বলতে শুনেছি, 'জমিজমা ভিটামাটি, ঘ্যাশ থনে কিছুই আনতে পারি নাই। আনছি খালি মুখের এই ভাষাখান; এরে আমি ছাড়তে পারুম না।' মৃত্যু পর্যন্ত এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে বলে মনে হয় না।

সৎ-মা কিন্তু পুরোপুরি দেশের ভাষাটা বলতে পারে না; তার কথায় এখানকার টান ঢুকে গেছে। আমি কিন্তু খাঁটি কলকাতার ভাষাতেই কথা বলি। হাবু গণেশ বাচ্চুও তাই। আমি খুব ছেলেবেলায় কলকাতায় এসেছি। হাবুরা তো এখানেই জন্মেছে। মাঝে মধ্যে শখ করে যদি ঢাকার ভাষায় কিছু বলি, নিজেদের কানেই বিশ্রী শোনায়।

কাঁচা উঠোন থেকে বারান্দায় উঠতে উঠতে বললাম, 'সেই শ্যামবাজারের ওধারে গিয়েছিলাম। খেয়ে উঠতে উঠতেই তো ন'টা বেজে গেল। তারপর ট্রাম-বাসে আসা—' ডাহা মিথ্যেগুলো আমার গলায় আটকে আসতে লাগল।

বাবা বলল, 'হ, অতখানি পথ আসা সোজা কথা না। তার উপর ট্রাম-বাসের যা হাল হইছে! কখন কোন্‌টা বন্ধ হইয়া যায়।'

আমার ঘরে গিয়ে হাতড়ে হাতড়ে মোমবাতি আর দেশলাই বার কা্র জ্বালিয়ে নিলাম। প্রায়ই আলো নিভে যায় বলে এদিককার সব বাড়িতেই মোম-টোম মজুত করে রাখা হয়।

দামী কাপড়-জামা ছেড়ে আধময়লা শাড়ি আর সস্তা লনের ব্লাউজ পরে নিলাম। তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে হাত-আয়নাটা মুখের কাছে তুলে ধরলাম; তক্ষুণি চমকে উঠলাম। কপালে সিঁথিতে এখনও প্রচুর সিঁদুর লেগে আছে, ট্যাক্সিতে সবটা তুলতে পারি নি।

আমাদের বাড়িতে ইলেকট্রিক লাইট আছে। ভাগ্যিস আজ সাপ্লাইতে গোলমাল হয়েছিল। নইলে সৎ-মা'র যা চোখ, নির্ঘাত ধরা

পড়ে যেতাম। তারপর তোপের মুখে সে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যেত। তখনকার কথা ভাবতেই আমার গায়ে কাঁটা দিল।

কারো চোখে পড়বার আগেই সিঁদুরটা তুলে ফেলা দরকার। তাড়াতাড়ি আয়নাটা নামিয়ে গামছা আর সাবান-টাবান নিয়ে ঘরের বাইরে এলাম। লক্ষ করলাম, গণেশ রান্নাঘরে বাবার পাশে বসে খাচ্ছে।

আমার পায়ের শব্দে বাবা মুখ তুলল। বলল, 'বিয়া বাড়িতে কেমুন খাওয়াইল রে?'

নেমন্তন্ন খেয়ে যে-ই ফিরুক, বাবা তাকে এই কথাটা জিজ্ঞেস করবেই। আসলে মানুষটা ভালমন্দ খেতে খুব ভালবাসে; কিন্তু খেতে আর পায় কই? বললাম, 'ভালই।'

'আহা, ভাল তো খাওয়াইবই। কী কী খাওয়াইল তাই ক' (বল্)।'

যা যা খেয়ে এসেছি, বললাম।

শুনতে শুনতে মোমের আলোয় বাবার চোখ চকচক করতে লাগল। মোটা মোটা গাঁটওলা আঙুলে রেশনের কালো কালো গমের আটার রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে বাবা বলল, 'চাইর রকমের মাছ খাওয়াইছে?'

'হ্যাঁ।'

'কী কী মাছ?'

'রুই, চিতল, ভেটকি আর চিংড়ি—'

বাবার ওপাশ থেকে গণেশ চেঁচিয়ে উঠল, 'আর বলিস না দিদি, গলায় কুমড়োর ঘ্যাট আর রুটি আটকে যাচ্ছে।'

একটু আগে বাবা গণেশের ওপর যে ক্ষেপে উঠেছিল, এখন আর তা মনে নেই। ভাল খাবার-দাবারের কথা উঠলে বাবা সব ভুলে যায়। আপন মনে সে বলতে লাগল, 'চিতল মাছ যে কতকাল খাই নাই। ঢাকায় যখন পড়াশুনা করতাম মাঝে মইধ্যে 'শান্তি বোর্ডিং'-এ গিয়া চিতলের পেটি খাইতাম। আধ হাতের উপরে এককেখান পেটি। সেই সস্তাগণ্ডার দিনেই দাম নিত ছয় আনা। মুখে তার সোয়াদ লাইগা আছে।'

আমি উঠোনে নেমে টিউবওয়েলের কাছে চলে গেলাম।

বাবা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'দুই রকমের মাংসের কথা ক'লি (বললি); নিশ্চয়ই পাঁঠা আর মুরগি?'

বালতিতে জল ভরতে ভরতে উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ—'

বাবা বলতে লাগল, 'চাইর রকমের মাছ, দুই রকমের মাংস, দই, রাবড়ি, কাঁচাগোল্লা, পোলাও—বাঃ, বেশ খাওয়াইছে।' মুখের ভেতর সুস্বাদু খাবারের নামগুলো নানাভাবে নাড়াচড়া করতে লাগল বাবা। আপাতত এতেই তার সুখ।

বাবা আবার বলল, 'প্যাট ভইরা খাইছস তো?'

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আমার ওপর এক ধরনের স্নেহ আছে বাবার। ঠিকমতো খাই-টাই কিনা, মেজাজ ভাল থাকলে মাঝে মাঝে খোঁজ নেয়। আমি কিছু বলবার আগেই সৎ-মা ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'কথার কি ছিরি! খেতে বসে কেউ পেট না ভরলে ওঠে!'

'না, তাই কইতে আছিলাম।'

একটু চুপ।

তারপর রুটির টুকরো মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে জড়ানো গলায় বাবা আবার শুরু করল, 'নিমন্তন্ন বাড়ি গেলে যত পারবি মাছ-মাংস, রসগোল্লা-সন্দেশ খাবি। প্রোটিনটা খাওন দরকার। নিজেরা তো আর কিনা (কিনে) খাইতে পারি না।'

নেমন্তন্ন বাড়ি গিয়ে প্রোটিন খেতে বাবা শুধু আমাকেই বলে না; এই পরামর্শটা ঢালাওভাবে পরিবারের সবাইকে তো বটেই, চেনা জানা প্রত্যেককে দিয়ে থাকে।

সৎ-মা ধমকে উঠল, 'বকবকানি থামাও তো।'

বাবা আর কিছু বলল না।

আমি প্রথমে ভাল করে সিঁদুর-টিঁদুর তুলে ফেললাম। তারপর হাত-পা মুখ-টুখ ধুয়ে, ঘাড়ে-গলায় জল দিয়ে গামছায় মুছতে মুছতে ঘরে ফিরে এলাম।

এতক্ষণ আমার স্নায়ুগুলো চড়া তারে যেন বাঁধা ছিল। সেই দুপুর

থেকে যা-যা করেছি, সব বোধহয় সজ্ঞানে নয়; অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে। এখন সেই ঘোরটা কেটে যাচ্ছে। রক্তের ভেতর যে উত্তেজনা এতক্ষণ উঁচু পর্দায় বাজছিল এখন সেটা থিতিয়ে আসছে।

ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল। আজ সমস্ত দিন আমার ওপর দিয়ে নিদারুণ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো কিছু ঘটে গেছে। তিরিশ বছরের জীবন এমন ওলট পালট আর কখনও হয় নি। এখন বিছানায় শরীর এলিয়ে দিতে পারলে বাঁচি। ঘুম একটানা ঘুম আমার দরকার।

ভিজে গামছাটা দড়িতে ঝুলিয়ে দ্রুত মশারি টাঙিয়ে নিলাম। দরজায় খিল লাগাতে যাব, সেইসময় রান্নাঘর থেকে সৎ-মা ডাকল, 'বকুল—'

দরজার বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, বাবা আর গণেশের খাওয়া হয়ে গেছে। বাবা আঁচিয়ে-টাচিয়ে বারান্দায় একটা জলচৌকিতে বসে এখন বিড়ি টানছে। গণেশ কলতলায় কুলকুচি করে মুখ ধুচ্ছিল। সৎ-মা এঁটো বাসন-কোসন একধারে সরিয়ে জায়গাটা মুছে নিচ্ছে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'ডাকছ কেন?'

সৎ মা বলল, 'একটু খাবি নাকি?'

'এই তো বিয়েবাড়ি থেকে গলা পর্যন্ত ভর্তি করে এলাম। এখন আবার কিসের খাওয়া!'

'শ্যামবাজার থেকে আসছিস। বাসের ঝাঁকুনিতে আবার খিদে পেয়ে যাবার কথা।'

যেদিন থেকে চাকরি নিয়েছি, সৎ-মা'র কথাবার্তা, আমার সম্বন্ধে তার মনোভাব অন্যরকম হয়ে গেছে। তার চোখে-মুখে কণ্ঠস্বরে এখন স্নেহের ছোঁয়া পাওয়া যায়। ব্যবহারও অনেকটা সখির মতো হয়ে উঠেছে। বললাম, 'না-না, আমার খিদে পায় নি।'

'না খাস না খাবি; ওখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস? রান্নাঘরে আয় না—'

'আমার খুব ঘুম পাচ্ছে।'

'ঘুম যেন পলিয়ে যাচ্ছে। ক'টা আর বাজে। এগারোটার

বেশি হবে না।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রান্নাঘরে গিয়ে বসতে হল।

সৎ-মা এনামেলের থালায় রুটি কুমড়োর তরকারি, ডাঁটি-ভাঙা কাপে একটু ডাল নিয়ে খেতে বসে গেল। বলল, 'এখনও ছাখ খাবি কিনা --'

'বললামই তো, খাব না।'

ডালে ভিজিয়ে রুটি মুখে পুরতে পুরতে সৎ-মা বলল, 'বিয়ে কেমন হল ?'

আবার বিয়ের প্রসঙ্গ। হঠাৎ শীত-লাগার মতো আমার গায়ে কাঁপুনি ধরে গেল।

আমার এই সৎ-মা'টি লেখাপড়া শিখলে ক্রিমিনাল কোর্টের বাঘা উকিল হতে পারত। উল্টোপাল্টা জেরায় সে ওস্তাদ। জেরার মুখে ফস করে কি বলতে কি বলে ফেলব। ক্লান্ত শরীরেও চোখ-কান সজাগ করে রাখতে হল। বললাম, 'ভালই।'

'ছেলে কী করে ?'

যা মুখে এল বলে ফেললাম, 'ব্যাঙ্কে চাকরি করে।'

'কি রকম মাইনে-টাইনে পায় ?'

'হাজার দেড়েক।'

'দেড় হাজার !' সৎ-মা'র খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

'হ্যাঁ।'

'মেয়েকে কী দিলে-টিলে ?'

আমার চোখ-মুখ ঝাঁ-ঝাঁ করছিল। সমুদ্রে ঝাঁপ দেবার মতো করে বললাম, 'কুড়ি ভরি সোনা, ফার্নিচার, ছেলের ঘড়ি, আংটি, বোতাম, রেডিও, সাইকেল, সেলাইকল—' কে যে আমার ভেতর থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে বলাতে লাগল, কে জানে।

'এত !' সৎ-মা'র চোখ যেন জ্বলতে লাগল। কেউ কিছু পেয়েছে কিংবা সুখী হয়েছে শুনলে সে ক্ষেপে ওঠে।

পরের সুখে কাতর, পরের আনন্দে ক্ষুব্ধ, এমন মানুষ আমি আর

দেখি নি। আসলে সৎ-মা'র মনোভাব আমি খানিকটা বুঝি। জীবনে কিছুই পায় নি সে, কোন সাধই তার মেটে নি। ভাল খেতে ভাল পরতে কোনদিনই তাকে দেখি নি। তাই অন্যের সৌভাগ্য তাকে উত্তেজিত ক্রুদ্ধ করে তোলে। যাই হোক, তাকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সট করে উঠে পড়লাম, 'বড্ড ঘুম পাচ্ছে; আমি আর বসে থাকতে পারছি না।'

'বাবারে বাবা, কতকাল যেন ঘুমোস নি! বোস্ না আরেকটু। 'ছেলেদের বাড়ি-টাড়ি আছে? অত মাইনে যখন পায় তখন নিশ্চয়ই গাড়িও আছে।'

'কাল বলব।' প্রায় ছুটতে ছুটতে নিজের ঘরে এসে আমি অবাক। গণেশ এবড়ো খেবড়ো মেঝের ওপর মাদুর পেতে বিছানা করছে। নীলিমা আর তার বর অজয় এলে গণেশ এ ঘরে এসে বিছানা পাতে। কিন্তু আজ তো ওরা আসে নি।

আমাকে দেখে একমুখ হাসল গণেশ। বলল, 'আজ এখানেই শোব রে দিদি—'

'তোর ঘরে কী হল?'

'আর বলিস না, পেছন দিকের ড্রেনে কি একটা পচেছে। কালই গন্ধ ছেড়েছিল; আজ আর টিকতে পারছি না।' তাই তোর ঘরে পালিয়ে এলাম।'

'বেশ করেছিস।'

'ভাবছি কাল একবার মিউনিসিপ্যালিটিতে খবর দেব; ওটা না সরালে আমার ঘরে আর ঢোকা যাবে না।' বলতে বলতেই উত্তেজিত হয়ে উঠল গণেশ, 'খবর দিয়ে কচু হবে। ট্যাক্স আদায় ছাড়া ওরা আর কিছু করে নাকি। যাক গে, কাল যা হয় করব।'

মশারি টাঙিয়ে টুক করে ভেতরে ঢুকে পড়ল গণেশ। বলল, 'তুই দরজাটা দিয়ে দিস দিদি।'

আমি দরজা-টরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর রান্নাঘরে বাসন নাড়াচাড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। সৎ-মা'র খাওয়া বোধ হয় শেষ হল ; এখন খুব সম্ভব থালা গেলাস-টেলাস গোছগাছ করে রাখছে।

হঠাৎ গণেশ ডাকল, 'দিদি—'

বললাম, 'তুই এখনও জেগে আছিস ! সাড়াশব্দ নেই দেখে ভেবেছিলাম, হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিস।'

'না রে। শুলেই আমার ঘুম আসে না।'

'ডাকলি কেন, কিছু বলবি ?'

'না, তেমন কিছু না।' একটু চুপ করে থেকে গণেশ বলল, 'তোর বন্ধুর যে বিয়ে হল, সেটা কি 'লাভ ম্যারেজ' ?'

গণেশ আমার ভাই, তবু ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা খুব সহজ। অনেকটা বন্ধুর মতো। একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বললাম, 'হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞাসা করছিস।'

'নি।এম মনে হল, বলে ফেললাম।'

'হ্যাঁ, লাভ ম্যারেজ।'

ওদিকে মুখ করে শুয়ে ছিল গণেশ। অন্ধকারেও বুঝতে পারলাম সে আমার দিকে ফিরল। তারপর হাল্কা গলায় বলল, 'তুই এক নম্বরের বোকারাম।'

বললাম, তার মানে ?'

'তোর বন্ধুরা একেকটা লাভার জুটিয়ে সটাসট কেমন বিয়ে করে ফেলছে। আর তুই খালি নেমন্তন্ন খেয়েই যাচ্ছিস। সারা জীবন পরের বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়ে কাটালেই চলবে ?'

আমি চুপ করে থাকলাম। বুকের ভেতর ছোটবড় কত ঢেউ যে খেলতে লাগল।

গণেশ আবার বলল, 'তুই দেখতে এত সুন্দর। ঘরে তো আর বসে থাকিস না। অফিস-টফিস যাস, রাস্তাঘাটে বেরোস, এখনও কেউ তোর কাছে ঘেঁষল না ?'

আমার কান লাল হয়ে উঠেছিল। জড়ানো গলায় বললাম,

'ফাজলামো করবি না গণেশ। চড় খাবি কিন্তু।'

গণেশ হাসতে লাগল। হাসতে হাসতেই আচমকা বলল, 'তোর কত বয়স হল রে দিদি?'

'আমার বয়স দিয়ে কি হবে?'

'বল্ না—'

'তিরিশ। কেন?'

'চটপট একটা লাভার-টাভার জুটিয়ে ফ্যাল দিদি। এর পর আর কিন্তু পাবি না!'

বললাম, 'এবার সত্যিই তুই মার খাবি। পিঠ তোর শুলোচ্ছে।'

গণেশ বলতে লাগল, 'ইচ্ছে হলে মার। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিস দিদি'

সন্দিগ্ধ ভাবে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী?'

'তুই স্বপ্নেও ভাবিস না বাবা-মা তোর বিয়ে দেবে।'

আমি জানি এ বাড়িতে একমাত্র গণেশই আমার কথা যা একটু ভাবে। আমার সম্বন্ধে তার গভীর সহানুভূতি। একেক সময় আমার হয়ে সমস্ত সংসারের বিরুদ্ধে সে রুখে দাঁড়ায়। আমি চাকরি পাবার পর সৎ-মা আর বাবা যে স্নেহ-মমতাটুকু দেখাচ্ছে তার পেছনে আছে অন্য রকমের খেলা। কিন্তু সে কথা এখন না, পরে।

গণেশ আবার বলল, 'যা করবার তোর নিজেরই করতে হবে। যদি না পারিস, আমাকে বলিস, তোর হাজব্যাণ্ড যোগাড় করে দেব।'

ধমকের গলায় বললাম, 'আর বকবক করতে হবে না। এবার ঘুমো তো—' বলতে বলতেই বিজনের সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। বিজন বাড়িতে আলটিমেটাম দিতে বলেছে, তার ধনুর্ভাঙা পণ দু'মাস পর যেভাবেই হোক আমাকে নিয়ে সংসারযাত্রা শুরু করবে। তার আগে বাড়িতে চরমপত্র দিতে হবে। বলতে হবে, যে যার ব্যবস্থা করে নাও। তখন নেশাগ্রস্ত মানুষের মতো আমি এক অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে ছিলাম। বিজন যা বলেছে তাতেই সায় দিয়েছি।

কিন্তু এখন ঘোর অনেকটা কেটে এসেছে। তাইতেই বুঝতে

পারছি বাড়িতে আলটিমেটাম দেওয়া কি এতোই সহজ? তিনটে ভাই বেকার। বাবা বার সাতেক নানা জায়গায় চাকরি খুইয়ে কিছুদিন হল একটা ছোটখাটো মারোয়াড়ি ফার্মে দেড়শ টাকা মাইনের একটা কাজ করছে। ফার্মটার অবস্থা খুব ভাল না। যে কোনদিন লালবাতি-জ্বালাতে পারে। এ বাজারে দু' আড়াই টাকা যখন চালের কিলো-মাছের কিলো সাত-আট টাকা, তখন দেড়শ টাকায় কি হয়? সংসারের প্রায় সব ভারটাই আমার কাঁধে। কাঁধটা সরিয়ে নেবার আগে আমাকে একটু ভাবতে হবে বৈকি। তাছাড়া চলে যাওয়া তো অনেক দূরের ব্যাপার। তার আগে বিয়ে যে করেছি, সেই কথাটা জানাতে হবে। সেটা জানাতে কতদিন লেগে যাবে তাই বা কে জানে। আমি যা মেয়ে, সহজে মুখই খুলতে পারি না। যাই হোক, যাবার আগে অন্তত ভাইদের কারো চাকরি-বাকরি পাওয়া দরকার। হাবু বাচ্চুকে দিয়ে আশা নেই। সেভেন-এইট পর্যন্ত উঠেই ওরা পড়া ছেড়ে দিয়েছে। ওই বিদ্যায় এ বাজারে বেয়ারার চাকরিও হয় না। যা কিছু ভরসা গণেশের ওপর। ও কমার্স নিয়ে প্রি-ইউনিভার্সিটিটা পাশ করেছে। তারপর আর পড়ল না। আমি অবশ্য পড়াতে চেয়েছিলাম। গণেশ বলেছে, 'না, হোল ফ্যামিলি তুই টানছিস; তার ওপর আর বোঝা চাপাবো না। যদি চাকরি-বাকরি পাই, নাইট ক্লাসে ভর্তি হয়ে যাব।' আমার প্রতি গণেশের মমতাটা বিশুদ্ধ। কিন্তু লক্ষ্য করছি ছেলেটা দ্রুত নৈরাশ্যের শিকার হয়ে যাচ্ছে। জীবনের ওপর ওর বিশ্বাস ক্রমশঃ কমে যেতে শুরু করেছে। আগে আগে, পি-ইউ পাশ করার পর চাকরি-বাকরির জন্য এখানে-ওখানে ছোটাছুটি করত। সপ্তাহে দু'বার করে যেত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে। চার বছর ঘোরাঘুরি করবার পরও যখন একটা ইণ্টারভিউ পর্যন্ত বার করতে পারল না তখন দুম করে একদিন চাকরির চেষ্টা ছেড়ে দিল গণেশ। আজকাল সারাদিনই প্রায় 'ভূপতি কেবিনে' আড্ডা দেয়; জুয়া-টুয়ার আড্ডায় গিয়ে বসে কিনা জানি না। ওকে বাঁচাতে হলে এখনই একটা চাকরি জুটিয়ে দেওয়া দরকার। তা ছাড়া ওর রোজগারের একটা ব্যবস্থা না হলে চট করে

এ বাড়ি থেকে আমার পক্ষে চলে যাওয়ার অনেক অসুবিধে। বাধা কেউ দিতে পারবে না। রোজই তো অফিসে যাই, একদিন আর না ফিরলেই হল। কিন্তু আমি জানি, বাধাটা আছে আমারই দুর্বল ভীরু মনের গভীরে।

গণেশের চাকরির জন্য এবার একটু চেষ্টা-টেষ্টা করতে হবে। চেনা শোনা সবাইকে আগেই বলে রেখেছি; আবার তাদের মনে করিয়ে দেব। ভাবছি, একদিন আমাদেব জেনারেল ম্যানেজার সেন সাহেবের ঘরে চোখ-কান বুজে ঢুকে পড়লে কেমন হয়? তাকে ধরলে একটা কিছু হবে না? তক্ষুণি অন্য একটা কথা মনে পড়ে গেল। অফিসের মেয়েবা অর্থাৎ কনক পূর্ণিমা আবত্তিরা বলে, সেনসাহেব লোকটা টেরিফিক পাজী। মেয়ে দেখলেই তার জিভ দিয়ে নাকি জল গড়াতে থাকে। স্টেলা তো পবিষ্কার বলে, 'হী ইজ এ শার্ক। তবে ওকে দিয়ে কাজ হয়। ইয়াং হ্যাণ্ডসাম মেয়ে কোন রিকোয়েস্ট করলে সেন-সাহেব তা বাখে। কিন্তু তার বদলে কিছু দিতে হয়। সেন সাহেবের কথা হচ্ছে ইউ গিভ মী সামথিং, আই গিভ ইউ সামথিং।' বলে আর অশ্লীল শব্দ করে হাসে। অফিসসুদ্ধ সবাই জানে ছুটির পরে সেন-সাহেবের গাড়িতে চড়ে তাকে সঙ্গ দিয়ে দু-দুটা ভাইকে আমাদের অফিসে ঢুকিয়ে দিয়েছে স্টেলা। কথাটা মনে পড়তেই আমার উৎসাহ দ্রুত জুড়িয়ে আসতে লাগল।

গণেশ বলল. 'কি রে দিদি, চুপ কবে আছিস কেন? ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?'

বললাম, 'না।' হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল. 'এই গণেশ—'

মাসকয়েক আগে জোর-জার কবে গণেশকে টাইপের স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলাম। ভর্তির টাকাটা আমিই দিতে চেয়েছিলাম; গণেশ নেয় নি। নিজেই যেন কোত্থেকে যোগাড় করে নিয়েছিল। তারপর আর এ ব্যাপারে বিশেষ খোঁজ-টোঁজ নিই নি। বললাম, 'হ্যাঁ রে, টাইপটা এখনও করছিস?'

'না।'

'কেন ?'

খুব উদাসীন সুরে গণেশ বলল, 'ধুস, ওসব করে কী হবে—'

বললাম, 'চাকরির জন্যে ওটা দরকার।'

'চাকরি বাকরি আমার হবে না।'

'তোকে বলেছে।'

'দ্যাখ দিদি, শাঁসালো কাবো শালা-টালা না হতে পারলে আজকাল আর চাকরি হয় না।' বলতে বলতে হঠাৎ গণেশের গলায় রগড়ের ছোঁয়া লাগল, 'তুই একটা কাজ করলে পারিস।'

'কি রে ?'

'ভাল মক্কেল দেখে ঝুলে পড়্। দেখবি তার পরদিনই আমার চাকরি হয়ে যাবে।'

'ইয়ার্কি হচ্ছে, না! ফাজিল—'

গণেশ হাসতে লাগল।

আমি বোঝাতে চাইলাম, 'এত হাল ছেড়ে দেবার মতো কিছু হয় নি। কাল থেকে আবার টাইপের স্কুলে যাবি, বুঝলি ?'

গণেশ বলল, 'আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে রে দিদি—'

'থাক। কাল থেকে টাইপ স্কুলে যাবি তো ?'

ওপাশ ফিরে শুতে শুতে গণেশ বলল, 'কালকের কথা কাল ভাবা যাবে।'

'তার মানে যাবি না ?'

গণেশ সাড়া দিল না। একটু পর তার নিশ্বাস ভারী এবং গাঢ় হয়ে এল। অর্থাৎ সে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি আর ডাকাডাকি করলাম না।

আমার দেহে এবং মনে সারাদিনের ক্লান্তি মাখা। ভেবেছিলাম বিছানায় গা এলিয়ে দিলেই ঘুমিয়ে পড়তে পারব। কিন্তু ঘুম আসছে না। যতক্ষণ গণেশের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, কিছুটা অন্যমনস্ক ছিলাম। কিন্তু এখন ফাঁকা ঘরে ঝাঁক ঝাঁক পাখি আসার মতো সমস্ত দিনের সব ঘটনা হুড়মুড় করে আমার মনে ভিড় করতে লাগল।

রাত ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। এখন ক'টা বাজে কে জানে।

মাথার দিকের জানলাটা খোলা রয়েছে। তার মধ্য দিয়ে আকাশ দেখা যায়। শরতের নীলাকাশ যেন অগাধ সমুদ্র ; তার গায়ে রুপোর থালার মতো চাঁদটা ভাসছে। শান্ত কোমল জ্যোৎস্নায় চারদিক ডুবে আছে। দিনের বেলায় কুশ্রী, নোংরা, আবর্জনা আর দুর্গন্ধে ভরা শহরতলীকে এখন আর চেনা যাচ্ছে না। চঁদের আলোয় সব কিছু রহস্যময় আর অপরিচিত হয়ে উঠেছে।

বাবা-মা অনেকক্ষণ আগে পাশের ঘরে ঢুকে পড়েছে। তারপরও রান্নাঘরে দু দু'বার শব্দ হয়েছে। তার মানে হাবু আর বাচ্চু ফিরে এসেছে। ওরা আলো-টালো জ্বালে না ; অন্য দিনের মতো অন্ধকারে বসেই খেয়ে টেয়ে শুতে চলে গেছে। রাত্রিবেলা ওরা কি করে যে ছাখে কে জানে। দুটোরই বেড়ালের চোখ।

চাঁদের আলো, শরতের শান্ত নরম নীলাকাশ, গণেশের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ কিংবা আজকের গোটা দিনটার যত ঘটনা আর উত্তেজনা, কিছুই যেন এই মুহূর্তে দেখতে শুনতে বা বুঝতে পারছি না। সব দৃশ্য, গন্ধ এবং শব্দ ঠেলে বার বার চোখের সামনে যে ভেসে উঠতে লাগল সে বিজন।

বিজনের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়েছিল কবে ? কিন্তু সে কথা এখন না ; তার আগে আমাদের সংসারের আরো কিছু কথা আছে।

আগেই আপনাদের বলেছি, আমরা পূর্ব বাঙলার মানুষ। পার্টিসানের বছরই সীমান্তের এপারে চলে এসেছি।

আমরা এসেছিলাম তিনজন। বাবা, সৎ-মা আর আমি। আমার নিজের মা তার তিন চার বছর আগে, দেশে থাকতেই মরে গেছে।

আমরা যখন এপারে চলে আসি তখন আমার বয়েস মোটে সাত। সৎ-মা'র একুশের মতো ; বাবার চল্লিশ বেয়াল্লিশ হবে। আরেকটা কথা, সৎ-মাকে বাবা তখনও বিয়ে করে নি।

আমাদের সঙ্গে আগে থেকেই লতায় পাতায় সৎ-মাদের কি রকম

একটা আত্মীয়তা ছিল। বাবার পিসতুতো বোনের ননদের কী যেন হতে সৎ-মা।

পার্টিসানের পর পরই দেশ যেন নরক হয়ে উঠেছিল, বিশেষ করে যুবতী মেয়েদের পক্ষে। আর সেই যুবতী যদি রূপসী হয় তবে তো কথাই নেই; তাকে ছিনিয়ে নেবার জন্য হাজারটা অশ্লীল কদর্য হাত এগিয়ে আসত।

সৎ-মা'র যারা বাবা-মা, তাদের তখন এমন অবস্থা যে দেশ ছেড়ে আসতে পারছিল না; আবার মেয়েকে নিজের কাছে রাখতেও সাহস পাচ্ছিল না। এমন সময় আমরা কতকাতায় আসছি জেনে মেয়েকে বাবার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল। মেয়ে যাতে বোঝা হয়ে না থাকে, সে জন্য কিছু টাকাও দিয়েছিল। বলেছিল, 'আমাগো যা হওনের হউক, মাইয়াটা তো বাচুক।'

যাই হোক কলকাতায় এসে হরিদাসপুর বর্ডারের রিফিউজি ক্যাম্পে আমরা ছিলাম দু'দিন; সেখান থেকে শিয়ালদা স্টেশনে এসে এক রাত্তির। তারপরই বাবা আমাদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ি খুঁজতে বেরিয়েছিল। এ শহর বাবার একেবারে অচেনা না; আগেও দু-চার বার এসেছে। সারাদিন খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত কালিঘাটের এক বস্তিমতো বাড়িতে বত্রিশ টাকায় খুপরি খুপরি দু'খানা ঘর ভাড়া করেছিল। খানকতক জামাকাপড় আর দু-একটা বাসন-টাসন ছাড়া দেশ থেকে আর কিছুই আনতে পারি নি। বাবা অবশ্য পায়ের ব্যাণ্ডেজের ভাঁজে ভাঁজে নোট সাজিয়ে কয়েক হাজার টাকা এনেছিল।

বাড়ি ভাড়া করবার পর হাঁড়ি-কড়া-উনুন থেকে শুরু করে চাল-ডাল-তেল-নুন পর্যন্ত সংসারের যাবতীয় দরকারী জিনিস কিনে আনতে হয়েছিল।

কালিঘাটের সেই ভাড়া বাড়িতে আমরা মাস দুয়েকের বেশি থাকি নি। তার মধ্যেই দক্ষিণ শহরতলীর শেষ মাথায় এই জায়গাটায় সস্তা দরে জমি কিনে বাড়ি তুলে ফেলেছিল বাবা। বাড়ি হবার পর আমরা এখানে চলে এলাম। তারপর বাইশ বছর পার হয়ে গেছে।

দেশে থাকতে বাবা নারায়ণগঞ্জের এক জুট মিলে কাজ করত। এখানে এসে বাড়ি-টাড়ি করবার পর হাতের সব টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিল। কাজেই বাবাকে চাকরির খোঁজে বেরুতে হয়েছিল।

বাবার মতো চটপটে কাজের লোক খুব কমই দেখেছি। একে-তাকে ধরে এখানে-ওখানে ক'দিন ঘুরে সত্যিই একটা কারখানায় চাকরি জুটিয়ে ফেলেছিল। অবশ্য সে চাকরিটা খুব বেশিদিন টেকে নি ; কেন না হু'বছর যেতে না যেতেই কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর কত চাকরি ধরল বাবা, কত চাকরি গেল। কোথাও ক্লোজারের তালা ঝুলল, কোথাও ছাঁটাইয়ের কাঁচি কচাৎ করে বাবার নামটা কেটে নামিয়ে দিল। বাইশ বছরে গণ্ডা গণ্ডা চাকরি করেছে বাবা ; কোনটাই স্থায়ী হয় নি। কিন্তু এসব পরের কথা।

এদিকে আমাদের সংসারের তলায় তলায় আরেকটা খেলা চলছিল। খেলাটা সেই বয়সে আমার বুঝবার কথা না ; তবু অদ্ভুত মনে হত।

আমাদের বাড়িতে তিনখানা ঘর। রাত্তিরে এক ঘরে থাকত বাবা, এক ঘরে সৎ-মা আর আমি, আরেকটা ঘরে তালা আটকানো থাকত।

মনে পড়ছে নতুন বাড়িতে উঠে যাবার পর কোন কোন দিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে শুনতে পেতাম, দরজায় আস্তে আস্তে টোকা পড়ছে। চাপা গলায় বাবা ডাকত, 'নিরু—নিরু, একটা কথা শুনে যাও।' সৎ-মা'র নাম নিরুপমা।

লক্ষ্য করতাম, দরজায় টোকা পড়লেই সৎ-মা কাঠ হয়ে যেত ; দু হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে থাকত।

বাবা ডেকে ডেকে একসময় চলে যেত। রোজই দরজায় টোকা পড়ত কিনা কিংবা বাবা ডাকত কিনা, জানি না। কেন না ছেলেবেলায় আমি ছিলাম ভীষণ ঘুমকাতুরে। সন্ধ্যে হলেই আমার চোখ জুড়ে আসত ; ঘাড়ের ওপর মাথাটা আর সোজা করে রাখতে পারতাম না।

সারাদিন সৎ-মা তো চোখের সামনে ঘুরত-ফিরত, যা বলবার তা কি আর অতখানি সময়ের মধ্যে বলা যেত না। তারপরও বাবার কি এমন কথা থাকতে পারে যাতে ওভাবে রাত্রিবেলা চোরের মতো এসে

দরজায় টোকা দিতে হবে! আমি ভেবে পেতাম না।

মনে আছে বাবা যতক্ষণ বাড়ি থাকত, সৎ-মা ভয়ে কেমন যেন হয়ে যেত। তার মুখে হাসি ছিল না; আতঙ্কের মতো কী একটা তাকে সর্বক্ষণ ঘিরে থাকত। মাঝে মাঝে হঠাৎ একেক সময় সে আমাকে বলত, 'বুঝলি বকুল, কেন যে বাবা-মা এখানে পাঠিয়েছিল! এর চাইতে দেশে থাকা অনেক ভাল ছিল।' আমি বলতাম, 'তোমার এখানে ভাল লাগে না?' সৎ-মা বলত, 'একদম না। খুব ভয় করে। কোন্ দিন যে কী ঘটে যাবে?' কী ঘটতে পারে আমি বুঝতাম না। অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

তারপর একদিন মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে যেতে দেখি পাশে সৎ-মা নেই; দরজাটা হাট করে খোলা। রোজ রোজ দরজায় ধাক্কা দিয়ে আর ডেকে ডেকে ফিরে যায় বাবা, সেদিন আর তাকে ফেরাবার শক্তি সৎ-মা'র মধ্যে ছিল না।

ফাঁকা ঘরে কতক্ষণ জেগে ছিলাম, এখন আর মনে পড়ে না। কখন একসময় আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পরের দিন সকালবেলা উঠে দেখি, উঠোনের একধারে দুই হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সৎ-মা। খোঁপা-টোপা ভেঙে পিঠময় চুল ছড়িয়ে আছে, চোখ টকটকে লাল, চোখের জলে গাল ভেসে যাচ্ছে।

পাশে দাঁড়িয়ে অপরাধীর মতো মুখ করে খুব নিচু গলায় বাবা তাকে কী যেন বোঝাচ্ছিল। সে কিছুই শুনতে চাইছিল না, উন্মাদের মতো সমানে মাথা নাড়ছিল।

বাবা কি বলছিল, দূর থেকে বুঝতে পারছিলাম না। তবে মনে হচ্ছিল, ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না। আমি আবার ঘরে ফিরে এসে চুপ করে বসে ছিলাম, আমার মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পর বাবা হঠাৎ আমার ঘরে এসে বলেছিল, 'নিরু আর আমি এট্টু বাইর হমু, যামু আর আমুম। তরে নিশিবাবুগো বাড়িতে রাইখা যামু। দুষ্টামি করবি না, বুঝলি?'

আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। বোকাটে মুখে কিছুক্ষণ

তাকিয়ে থেকে আস্তে করে মাথা হেলিয়ে দিয়েছিলাম।

নিশিবাবুদের বাড়িটা আমাদের পাশেই। আমাকে তাদের বাড়ি রেখে একটু পর সৎ-মাকে নিয়ে বাবা বেরিয়ে গিয়েছিল। ফিরে এসেছিল ঘণ্টা দেড় দুই পর। আমি লক্ষ্য রেখেছিলাম। ওরা ফিরতেই এক ছুটে বাড়িতে গিয়ে হাজির। গিয়েই থমকে গিয়েছিলাম। সৎ-মা'র কপালে আর সিঁথিতে তখন সিঁদুর, হাতে নতুন শাঁখা। তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিস্ময়ে আমার চোখে পলক পড়ছিল না।

সৎ-মাও আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছিল না। তার মুখ মরা মানুষেব মুখের মতো, সেখানে এক ফোঁটা রক্ত ছিল না যেন। স্তব্ধ একটা মূর্তির মতো নতচোখে সে দাঁড়িয়ে ছিল।

বাবা চোরের মতো মুখ করে একবার হেসেছিল। তারপর গালে হাত বুলোতে বুলোতে বিব্রতভাবে বলেছিল, 'অখন থেইকা নিরুরে মা ক'বি (বলবি)।'

একবার বাবাকে, আরেকবার সৎ-মাকে দেখতে দেখতে কখন আপনা থেকেই আমার মাথাটা একদিকে কাত হয়ে গিয়েছিল। তখন জানতাম না, অনেক পরে শুনেছি, বাবা সেদিন সৎ-মাকে কালীঘাট থেকে বিয়ে করে এনেছিল। ছেলেমেয়েদের বাপের বিয়ে দেখতে নেই, তাই বাবা আমাকে নিশিবাবুদের বাড়ি রেখে গিয়েছিল।

কালিঘাট থেকে ফেরার পব ঘণ্টাকয়েক সারা গায়ে বিষাদ মেখে বসে ছিল সৎ-মা। তারপর সব ঝেড়ে-ঝুড়ে যেন অদৃশ্য চাবুক হাতে উঠে দাঁড়িয়েছিল। সেদিন থেকে বাবা যা বলত তার ঠিক উল্টোটা করত সৎ-মা এবং চাবুক চালিয়ে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী বাবাকে চালাত। আর যখন-তখন চাপা গলায় তীক্ষ্ণ শিসের মতো শব্দ করে গজরাত, 'ঠগ, জোচ্চোর, বিশ্বাসঘাতক। বাবা বিশ্বাস করে হাতে তুলে দিয়েছিল ; তার মর্যাদা এইভাবে দিলে!'

বাবা মিনমিনে গলায় কী উত্তর দিত, বোঝা যেত না। তবে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি, বিয়ের আগে সৎ-মা বাবাকে ভয় করত। কিন্তু বিয়ের পর দান উল্টে গিয়েছিল। তখন থেকে বাবাই ভয় পেতে

শুরু করেছিল। সব সময় বাবা কুণ্ঠিত বিব্রত জড়সড় হয়ে থাকত। খুব দ্রুত পিঠ-টিঠ বেঁকে সে কোলকুঁজো হয়ে যাচ্ছিল।

মনে পড়ছে, বিয়ের আগে সৎ-মা আর আমি রাত্তিরে একঘরে থাকতাম, বাবা থাকত আরেক ঘরে। বিয়ের পর বাবা ঠিক করেছিল, আমরা সবাই একঘরে থাকব। বাবা সৎ-মা তক্তপোশে শোবে, আমার জন্য বিছানা হবে মেঝেতে। সৎ-মা বলেছিল, 'না। বকুল আলাদা ঘরে থাকবে।' বাবা ভয়ে ভয়ে বলেছিল, 'কিন্তু ও ছেলেমানুষ ; একা একা শুলে ভয় পাবে।' সৎ-মা দাঁতে দাঁত চেপে জেদী গলায় বলেছিল, 'আমি যা বলছি তাই হবে।'

সেদিন থেকে একলা ঘরে থাকতে শুরু করেছিলাম। ঘরে ঢুকেই সব দরজা-জানালা বন্ধ করে দিতাম। তবু ভয়ে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যেত।

বিয়ের আগে সৎ-মা আমাকে বেশ স্নেহ করত। মা-মরা মেয়ে বলে আমার সম্বন্ধে তার ছিল গভীর মমতা। কিন্তু বিয়ের পর সে অত্যন্ত রূঢ় আর নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল। একেক সময় তার ব্যবহারে আমার চোখে জল এসে যেত। লুকিয়ে লুকিয়ে কতদিন যে কেঁদেছি!

তখন দুর্বোধ্য মনে হত। পরে অবশ্য বুঝেছি বাবার প্রতি বিদ্বেষের জন্য আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করত সৎ-মা। বাবার দিক থেকে যা কিছু তাদের সবার বিরুদ্ধে সৎ-মা'র দারুণ আক্রোশ আর ঘৃণা।

মনে আছে বাবার এই দু' নম্বর বিয়ের মাস ছয়েক পর একটা বিচ্ছিরি ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। সৎ-মা'র বাবা হঠাৎ দেশ থেকে কলকাতায় এসে হাজির। একাই আসে নি, স্ত্রী-ছেলেমেয়ে—সবাইকে নিয়ে এসেছিল। আসার সময় মারোয়াড়ীদের কাছে হুণ্ডি করে প্রচুর টাকা এনেছিল। ওদের চলে আসার একটা বড় কারণ সৎ-মা। কেননা বিয়ের আগে বাবা তবু মাঝে মধ্যে ওদের এক-আধটা চিঠি দিত। কিন্তু বিয়ের পর এই যোগাযোগটুকুও রাখে নি। ওরা অবশ্য প্রতি সপ্তাহে চিঠি লিখে যেত। উত্তর না পেয়ে শেষ পর্যন্ত সব বেচে-টেচে চলে এসেছে।

বাবা না হয় যোগাযোগ রাখে নি, কিন্তু সৎ-মা কেন যে তার বাবাকে চিঠি-টিঠি লিখত না, আমার কাছে এই ব্যাপারটা এখনও অদ্ভুত লাগে।

যাই হোক কলকাতায় পা দিয়েই সৎ-মা'র বাবা-মা খুঁজতে খুঁজতে আমাদের বাড়ি চলে এসেছিল। মেয়েকে এভাবে আমার বাবার ঘর করতে দেখে প্রথমটা ওরা একবারে বোবা হয়ে গিয়েছিল। তারপর সৎ-মা'র মা হঠাৎ ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠেছিল। সৎ-মা'র বাবা ভাঙা হতাশ গলায় বলেছিল, 'তোমার মনে এই আছিল রাসমোহন! রক্ষক হইয়া শ্যাযে ভক্ষক হইলা! হ্যাশ থনে কত টান্‌ঠাবাজি (কৌশল) কইরা টাকা আনছি। দশটা না, পাঁচটা না, আমার ওই একটা মোটে মাইয়া। ভাবছিলাম তার ভাল বিয়া দিমু। হা ঈশ্বর!'

বাবা একটা কথারও উত্তর দ্যায় নি। ঘাড় গুঁজে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। তার হাত-পা আলগা আলগা হয়ে ঝুলে পড়ছিল যেন। মনে হচ্ছিল, তার গায়ের হাড়গুলো গলা মাংসের মতো নরম হয়ে গেছে; হুড়মুড় করে ধ্বংসস্তূপের মতো যে কোন সময় সে ভেঙে পড়বে।

একধারে দাঁড়িয়ে ছিল সৎ-মা। আক্রোশে উত্তেজনায় তার চোখ জ্বলছিল; বড় বড় নিশ্বাসে বুক দ্রুত ওঠানামা করছিল। বাবার দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে সে সমানে বলে গিয়েছিল, 'ইতর, নীচ, পশু—'

তারপর আর কী কী কথা হয়েছিল, এতদিন পর আর মনে পড়ে না।

একসময় ওরা চলে গিয়েছিল। পরে শুনেছি বেলগাছিয়ার দিকে বাড়ি-টাড়ি কিনে গেঞ্জির কল বসিয়ে প্রচুর টাকা-পয়সা করেছে।

অনেক দিন পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে ওদের কোনরকম সম্পর্ক ছিল না। ওরাও কেউ এখানে আসত না, আমাদের দিক থেকেও কেউ যেত না। সৎ-মা কেন যেত না, সেটা আমার কাছে এখনও রহস্যময়। তারপর বছর কয়েক হল বরফ গলতে শুরু করেছে; সম্পর্কটা মোটামুটি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। মাঝে-মধ্যে সৎ-মা বাপের বাড়ি যায়, সৎ-মা'র মা এবং ভাইরা এ বাড়ি আসে। কিন্তু বাবা এবং তার নতুন শ্বশুর, কেউ কারো

বাড়ি যায় না। তাদের মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

যাই হোক, বাবার ওপর সৎ-মা'র এত যে ঘৃণা, এত আক্রোশ, তবু বিয়ের পর বছর বছর তার ছেলেপুলে হতে লাগল। প্রথম চার বছরেই হাবু, নীলিমা, গণেশ আর বাচ্চু হয়ে গেল। এ ভাবে চলতে থাকলে সংখ্যাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াত, কে জানে। একদিন সৎ-মা সোজা ফ্যামিলি প্ল্যানিং সেণ্টারে গিয়ে অপারেশন করিয়ে এসে সংখ্যাটা চারেই ঠেকিয়ে দিল।

সংসারে জনবল যত বাড়ছিল, সেই অনুপাতে বাবার আয়-টায় বাড়ে নি। এদিকে পশ্চিম বাঙলার অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। ঝপাঝপ কলকারখানা এবং অফিসে তালা ঝুলতে শুরু করেছিল। বাবা একবছর হয়তো চাকরি করত, তারপর ছ'মাস বেকার বসে থাকত। ফল হয়েছিল এই, অভাব-অনটন পোষা বেড়ালের মতো আমাদের পায়ে পায়ে ফিরতে থাকত।

এ সংসারটার ওপর সৎ-মা'র বিদ্বেষ বরাবরের। তার ওপর নিয়ত অভাব তাকে আরও রুক্ষ আরো নির্দয় করে তুলেছিল। সব সময় সে চিৎকার করত, আমাকে আর বাবাকে দাঁতে ছিঁড়ে ফেলতে চাইত।

বাবা বিয়ের পর থেকে ক্রমাগত মার খেয়ে খেয়ে শেষ পর্যন্ত মুখ খুলতে শুরু করেছিল। চেঁচামেচি খুব একটা করত না; তবে মাঝে মধ্যে চাপা ষড়যন্ত্রভরা গলায় এমন একেকটা মন্তব্য ছুঁড়ে দিত যাতে সৎ-মা'র হাড়ের ভেতর পর্যন্ত জ্বলে যেত। বাবার যুদ্ধের রীতি ছিল অন্যরকম। দামামা বাজিয়ে সে লড়াইয়ের ময়দানে নামত না; আচমকা একেকটা চোরগোপ্তা আঘাত হানত।

আর আমি সারাদিন মনমরার মতো চুপচাপ বসে থাকতাম। এ বাড়িটা যেন এক বায়ুশূন্য গ্রহ, আমার নিশ্বাস এখানে বন্ধ হয়ে আসত। অবশ্য এক জায়গায় আমার ছোট্ট একটু আশ্রয় ছিল। লেখাপড়ায় মোটামুটি ভালই ছিলাম। প্রতিবেশী নিশিবাবুর চেষ্টায় স্কুলে ফ্রী-শিপ পেয়েছিলাম। বই-টই অবশ্য বাবা কোনদিনই কিনে দিতে পারত না। চেয়ে-টেয়ে যোগাড়-যন্ত্র করে কিংবা টুকে এনে পড়তে হত। দেখিয়ে

দেবার কেউ ছিল না। তা সত্ত্বেও রেজাল্টটা প্রতি বছরই ভাল হচ্ছিল। ফার্স্ট সেকেণ্ড হতাম। কি করে হতাম কে জানে।

যখনই মন খারাপ হত, বই নিয়ে বসতাম। ওটাই ছিল আমার বেঁচে থাকার শেষ দুর্গ। সৎ-মা গলার শির ছিঁড়ে চেঁচাতে থাকত, 'পড়ছেন! পড়ে পড়ে আমার চিতায় মঠ তুলবেন!' এ সংসারের সব কিছুর মতো আমার লেখাপড়ার ওপর ছিল সৎ-মা'র প্রচণ্ড রাগ। কিন্তু আমি তার কথায় কান দিতাম না।

নেহাত পয়সা খরচ করতে হয় না; নইলে ঢের আগেই আমার পড়া বন্ধ হয়ে যেত। স্কুলের ভাত ঠিকমতো পেতাম না; মাসের মধ্যে পনের দিন না খেয়ে ক্লাস করতে হত।

তা ছাড়া সৎ-মা'র পায়ে পায়ে ঘুরে সংসারের কত কাজ যে করতে হত! গণেশ আর বাচ্চু তখন খুব ছোট, জন্মের পর থেকেই ছিল ওরা দারুণ রিকেটী। যতক্ষণ ঘুমোত ততটুকু সময়ই শান্তি; যেই চোখ মেলত অমনি কান্না শুরু হয়ে যেত। কোলে নিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ওদের কান্না থামাতে হত আমাকেই। এত সবের পরও আমি পড়া ছাড়ি নি।

এইভাবে ক'টা বছর কেটে গেছে। দেখতে দেখতে আমার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা এসে গিয়েছিল। এতকাল নিজে নিজেই পড়েছি। কিন্তু ইংরেজি আর অঙ্কের এমন কিছু জটিল ব্যাপার আছে যেগুলো নিজে পড়ে ঠিক মাথায় ঢোকানো যায় না। টেস্টের পর বাবাকে বলেছিলাম, 'পরীক্ষার আর তিনমাস বাকি আছে, আমার জন্যে একজন মাস্টার রেখে দেবে?'

'কত লাগব?'

'চল্লিশ টাকার কমে কি আর পড়াবে?'

'আরে সর্বনাশ!'

সেই সময় মনে পড়ে গিয়েছিল আমার ক্লাসের তিনটে মেয়ে কালিঘাটের কাছে একটা টিউটোরিয়াল হোমে পড়ে; তাতে মাইনে খুব বেশি লাগে না। ইংরেজি অঙ্ক, দুটো সাবজেক্ট সপ্তাহে ছ'দিন পড়তে লাগে কুড়ি টাকা।

বলেছিলাম, 'তা হলে আমাকে টিউটোরিয়াল হোমে ভর্তি করে দাও—'

বাবা জিজ্ঞেস করেছিল, 'সেইখানে কত লাগব ?'

'কুড়ি টাকা।'

'আমারে কাইটা কুচি কুচি করলেও কুড়িখান পয়সা বাইর হইব না। নিজে নিজে যা পারো হেই পইড়া পরীক্ষা দ্যাও।'

ফস্ করে আলো নিভে যাবার মতো আমার মুখটা কালো হয়ে গিয়েছিল। বাবার কাছে আগে আর কখনও কিছু চাই নি। দারুণ অভিমানে আমার চোখে প্রায় জল এসে গিয়েছিল। পেছন ফিরে চলে যাচ্ছি, বাবা ডেকেছিল, 'শোন্—,

আমি দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম, 'কী ?'

'তিন মাসে লাগব ষাইট টাকা। কালিঘাট যাইতে আসতেও মাসে পাঁচ সাত টাকা। তার মানে হইল তিন মাসে আরো বিশ টাকা। আইচ্ছা দেখি কি করতে পারি—'

পরদিন বাবা আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে চারদিক দেখে পঞ্চাশটা টাকা দিয়েছিল। খুব নিচু গলায় বলেছিল, 'এর বেশি আর যোগাড় করতে পারলাম না রে।'

'কোথায় পেলে ?'

'ধার করছি।'

বাবা তখন একটা কণ্ট্রাক্টরের কাছে পৌনে দু'শ টাকা মাইনের চাকরি করে। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কি করে শোধ করবে ?'

বাবা আমার কাঁধে একটা হাত রেখে বলেছিল, 'সে তরে ভাবতে হইব না' একটু থেমে কি ভেবে বিষণ্ণভাবে বলেছিল, 'এই টাকায় তিন মাস চলব না রে ; যদ্দিন চলে পড়। ধার করার কথা কারোরে ক'বি (বলবি) না কিন্তু।' কারোকে বলতে বাবা যে সৎ-মা'র কথাই বলেছে তা বুঝতে আমার অসুবিধে হয় নি।

দ্বিতীয়বার বিয়ের পর থেকেই কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল বাবা। পারতপক্ষে কারো সঙ্গে কথা বলত না। সর্বক্ষণ দুই কাঁধে পাষাণভারের

মতো অপরাধের বোঝা চাপিয়ে উদাসীন অন্যমনস্ক হয়ে থাকত। কিন্তু তার অন্যমনস্কতা উদাসীনতার তলায় আমার জন্য দু-চার ফোঁটা স্নেহ তখনও যে থেকে গেছে, সেদিন টের পেয়েছিলাম।

পঞ্চাশ টাকায় দু'মাস তো চলবে। মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, বাড়ি থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত বাসে যাব, টালিগঞ্জ থেকে কালিঘাট হেঁটে। তাতে কিছু পয়সা নিশ্চয়ই বাঁচবে। দু'মাস পর বাবা যদি তার ওপর আর কিছু যোগাড় করে দিতে পারে, কোচিং ক্লাসটা একেবারে পরীক্ষা পর্যন্ত চালিয়ে নেওয়া যাবে।

আমি সেদিনই কালিঘাট গিয়ে টিউটোরিয়ালে ভর্তি হয়েছিলাম। আর সেদিনই ক্লাস করতে গিয়ে বিজনের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ।

এই টিউটোরিয়ালটায় আমাদের স্কুলের তিনটে মেয়ে পড়ত। তাদের সঙ্গেই ক্লাস করতে ঢুকেছিলাম। ওরা বলেছিল, 'আজ প্রথম ক্লাসটা বিজন সান্যালের ; টেরিফিক পড়ায়।'

জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কী পড়ায় ?'

'ইংরেজি।'

আমাদের ক্লাসে সবসুদ্ধ চারটে মেয়ে দুটো ছেলে। ক্লাসরুমে ঢুকে দেখি আমাদের আগেই ছেলেদুটো এসে বসে আছে। ওরা যেখানে বসেছে তার উল্টোদিকের বেঞ্চে আমরা সবে বসতে যাচ্ছি, ছিপছিপে পাতলা চেহারার, কাটাকাটা মুখের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি যুবক এসে ঢুকল। পরনে গেরুয়া পাঞ্জাবি, এলোমেলো চুল, হাতে দু-একটা কি বই। প্রথম দেখেই মনে হয়েছিল, মানুষটি অন্যমনস্ক ধরনের।

আমার পাশেই ছিল কৃষ্ণা। কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করেছিল, 'এই হল বিজন সান্যাল।'

আমরা দাঁড়িয়েই ছিলাম : বিজনকে দেখে সেই ছেলে দুটো উঠে দাঁড়িয়েছিল।

হাতের ইশারায় আমাদের বসতে বলে বিজন মাঝখানের চেয়ারে বসেছিল। বলেছিল, 'আজ কী পড়া আছে যেন ?'

একটি ছেলে সারা ক্লাসের হয়ে উত্তর দিয়েছিল 'ইংলিশ পোয়েট্রি স্যার—'

এক ঘণ্টার ক্লাসে তিনটে ছোট ছোট কবিতা পড়িয়ে সেগুলোর সবরকম প্রশ্নের উত্তর লিখিয়ে দিয়েছে বিজন। তার পড়াবার ধরন এত সুন্দর যে ওই কবিতাগুলো বই উল্টে আর আমাকে দেখতে হয় নি।

ঘণ্টাখানেক পড়াবার পর হঠাৎ বিজনের চোখ আমার ওপর স্থির হয়েছিল। এক পলক তাকিয়ে থেকে সে বলেছিল, 'তোমাকে তো আগে দেখি নি—'

চার ফুট দূরে এক ঘণ্টা বসে থাকবার পর তবে কিনা আমাকে দেখতে পেল! চোখ নিচু করে বলেছিলাম, 'আমি আজই ভর্তি হয়েছি।'

'তাই হবে।' আর কিছু না বলে বেরিয়ে গিয়েছিল বিজন।

তারপর জিওমেট্রি আর এ্যালজেব্রার ছুটো ক্লাস করে বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিলাম। বড় রাস্তায় এসে ওরা বাস ধরেছিল। 'একটা কাজ আছে' বলে আমি আর ওদের সঙ্গে যাই নি। আসলে আমি তো টালিগঞ্জ পর্যন্ত হেঁটে যাব।

রসা রোড ধরে হাঁটছিলাম। সবে সন্ধ্যে হয়েছে। রাস্তায় প্রচুর ভিড় আর আলো এবং গাড়ি। টালিগঞ্জ রেল ব্রিজের কাছে আসতেই পাশ থেকে কে যেন ডেকেছিল, 'আরে তুমি!'

চমকে মুখ ফেরাতেই বিজনকে দেখতে পেয়েছিলাম। একমুখ হেসে সে বলেছিল, 'একটু আগে তোমাকে টিউটোরিয়াল হোমে দেখলাম না!'

জড়সড় হয়ে তাড়াতাড়ি শাড়ির আঁচল দিয়ে গলা-টলা ঢেকে ফেলেছিলাম। আবছা গলায় বলেছিলাম, 'হ্যাঁ—'

বিজন বলেছিল, 'তোমরা এদিকেই থাকো নাকি?'

'হ্যাঁ—'

'কোথায়?'

'গড়িয়ার ওধারে।'

'সে তো অনেক দূর—' একটুক্ষণ অবাক চেয়ে থেকে বিজন বলেছিল 'অত দূর হেঁটে যাবে কি করে ?'

'হেঁটে যাব না—'

'হাঁটছ তো—' বিজন হেসে ফেলেছিল।

বিব্রত মুখে বলেছিলাম, 'আমার এদিকে একটু দরকার আছে।'

'ও। তারপর বাসে উঠবে ?'

'হ্যাঁ—'

'আচ্ছা, আমার একটু তাড়া আছে। চলি—' বড় বড় পা ফেলে খানিকটা এগিয়েই তক্ষুণি আবার ফিরে এসেছিল বিজন, 'ওই দেখ, আমার কি রকম ভুল—'

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিলাম।

বিজন বলেছিল, 'তোমার নামটাই জানা হয় নি।'

'আমার নাম বকুল—বকুল গুহ।'

শুনে আর দাঁড়ায় নি বিজন। আগের মতই লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গিয়েছিল।

পরের দিনও ছুটির পর রাস্তায় বিজনের সঙ্গে দেখা। হেসে হেসে সে বলছিল, 'আজও এদিকে কাজ আছে নাকি ?'

জড়ানো গলায় উত্তর দিয়েছিলাম, 'হ্যাঁ—মানে—'

তার পর দিনও দেখা হয়েছিল। তারও পরের দিন। কি আশ্চর্য, রোজই ছুটির পর রসা রোডের ফুটপাথে নিয়মিত দেখা হতে লাগল। কোনদিন আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে চারু এ্যাভেনিউ পর্যন্ত গিয়ে ডান দিকে ঢুকে যেত। কোনদিন, খুব তাড়াহুড়ো থাকলে কথা-টথা না বলে শুধু একটু হাসত ; তারপর পাশ কাটিয়ে চলে যেত।

কেমন যেন সন্দেহ হতে লাগল, আমার সঙ্গে দেখা হবে বলেই বিজন ছুটির পর রসা রোডের এই ফুটপাথ দিয়ে হাঁটে। পরক্ষণেই মনে হয়েছিল, আমার মধ্যে কী এমন আছে যাতে বিজনের মতো ভদ্র, শিক্ষিত যুবক পিছু নিতে পারে। এমন একটা বিশ্রী কথা কি করে যে ভাবতে পেরেছিলাম। সেদিন নিজের ওপরই আমার দারুণ রাগ হয়ে গিয়েছিল

দশ পনের দিন এইরকম চলল। তারপর হঠাৎ বিজন একদিন বলেছিল, 'কী ব্যাপার বল তো?'

বিজন কি বলতে চায় বুঝতে পারি নি; তার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিয়েছিলাম।

বিজন বলেছিল, 'রোজই তোমার এদিকে কাজ থাকে নাকি?'

এ রকম একটা প্রশ্ন বিজনের দিক থেকে আসতে পারে, ভাবি নি। আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলাম, 'না—মানে, ঠিক—'

'থাকো গড়িয়ার ওধারে। তবে এতটা রাস্তা শুধু শুধু হাঁটো কেন? কালীঘাট ট্রাম ডিপোর কাছ থেকেই তো বাস ধরতে পারো।'

উত্তর দিই নি।

বিজন আবার বলেছিল, 'কী হল, বলতে আপত্তি আছে নাকি? তবে থাক।'

আধফোটা গলায় বলেছিলাম, 'আমার হাঁটতে খুব ভাল লাগে।'

'তাই বলে রোজ রোজ?'

এতখানি রাস্তা হেঁটে যাবার যে কারণটি বলেছি, নিজের কাছেই তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় নি। বারকয়েক ঢোঁক গিলে এবার সত্যি কথাটাই বলে ফেলেছিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে বিজনের মুখটা সহানুভূতিতে কোমল হয়ে গিয়েছিল। তক্ষুণি সে আর কিছু বলে নি। পাশাপাশি বেশ খানিকটা হাঁটবার পর গাঢ় গলায় এক সময় বলেছিল, 'তোমার সঙ্গে আমার আশ্চর্য মিল। পয়সা বাঁচাবার জন্য আমিও টিউটোরিয়াল হোম থেকে রোজ চারু এ্যাভেনিউ পর্যন্ত হেঁটে আসি।'

চমকে বিজনের দিকে তাকিয়েছিলাম। লোকটা কি চতুর ষড়যন্ত্রকারী? আমি হাঁটার যে কারণ বলি, সে-ও তাই বলে যে! কিন্তু বিজনকে খুঁটিয়ে দেখে কোন চক্রান্তের আভাস পাওয়া যায় নি। বরং এমন সরল নিষ্পাপ পবিত্র মুখ আগে আর কখনও দেখেছি বলে মনে করতে পারছিলাম না।

মেয়েদের মন এমন আয়না যেখানে গম্ভীর গোপন যে কোন

ষড়যন্ত্রের ছায়া পড়বেই। কিন্তু প্রথম দিকে কিছুটা সংশয় থাকলেও বলেছিল মন দ্রুত পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল। সঙ্কোচের গলায় বলেছিলাম, রোজ এদিকে আসেন। দরকার থাকে বুঝি?'

বিজন বলেছিল, 'আমরা এদিকেই থাকি।'

নিজের অজান্তেই যেন ফস করে বলে ফেলেছিলাম, 'কোথায়?'

'চারু এ্যাভেনিউর পিছন দিকে; টালিগঞ্জ সার্কুলার ...ওর কাছে।'

ক্রমশ ব্যাপারটা সহজ হয়ে এসেছিল। ছুটির পর রোজই আমরা গল্প করতে করতে একসঙ্গে হেঁটে যেতাম। তারপর চারু এ্যাভেনিউর মুখে এসে বিজন ডানদিকে ঘুরে চলে যেত। আমি আরো অনেকটা এগিয়ে টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর কাছে গিয়ে বাস ধরতাম। কোন কোন দিন হাতে সময় থাকলে বিজন ট্রাম ডিপো পর্যন্ত এসে আমাকে বাসে তুলে দিত।

কথায় কথায় আমাদের বাড়ীর সব কথা জেনে নিয়েছিল বিজন; ওদের বাড়ির কথাও আমাকে বলেছিল।

আমাদের মতো বিজনরাও পূর্ব বাঙলার মানুষ। তবে ওরা দেশ-ভাগের আগেই কলকাতায় চলে এসেছিল। ওর বাবা নেই। বাবার মৃত্যুর পর মা'র মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। এক বিধবা দিদি তার একগাদা ছেলেপুলে নিয়ে তাদের বাড়িতে এসে আছে। ছোট একটা বোনের বিয়ে অবশ্য হয়ে গেছে কিন্তু সেটা সুখের বিয়ে নয়। শ্বশুর-বাড়িতেই তখন থাকত সে, কিন্তু সেখানে বনিবনা ছিল না।

বিরাট সংসারের সব দায়িত্ব বিজনের। তখন সবে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেছে সে। চাকরি-বাকরি কিছু ছিল না। অবশ্য খবর কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দেখে প্রায় রোজই একটা করে দরখাস্ত ছেড়ে যাচ্ছিল; তাতে পোস্টাল ডিপার্টমেণ্ট ছাড়া আর কারো উপকার হচ্ছিল না।

চাকরি থাক বা না-ই থাক, সংসার সে কথা শুনবে না। আট-দশটা মানুষের মতো চাল-ডাল-তেল-নুন রোজ যোগান দিয়ে যেতেই হবে।

'তখন সকাল-বিকেল দু' বেলা টিউটোরিয়ালে পড়াত ; গাদা শানি করত। আট-দশটা মানুষকে বাঁচাবার জন্য সর্বক্ষণ যুদ্ধ র যাচ্ছিল সে। ওর দিকে তাকিয়ে আমার বড় মায়া হত।

কোন কোন দিন পকেটে পয়সা থাকলে বিজন বলত, 'চল, একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক।'

কুণ্ঠিতভাবে বলতাম, 'আপনি খান ; আমি আজ যাই—'

বিজন চট করে আমার মনের কথাটা পড়ে নিত। বলত, 'আরে বাবা এক কাপ চা তোমাকে খাওয়াতে পারব। তাতে আমাদের কারোকে উপোষ দিতে হবে না।'

জোর করেই বিজন আমাকে কোন রেস্টুরেণ্টে নিয়ে যেত। পর্দা-ঢাকা ছোট্ট কেবিনের ভেতর মুখোমুখি বসিয়ে বলত, 'কী খাবে বল—'

চোখ নামিয়ে অস্পষ্ট গলায় বলতাম, 'চা—'। খাওয়ার ব্যাপারে আমার বড় লজ্জা।

বিজন বলত, 'চা তো খাবেই ; ওটা খাদ্য নাকি ? আর কী খাবে ?'

চোখ নামিয়ে আমি নখ খুঁটতে থাকতাম।

বিজন আবার বলত, 'কি বোকা মেয়ে ; খাওয়ার সময় অত লজ্জা কিসের ? আচ্ছা ঠিক আছে, টোস্ট আর আমলেট আনতে বলি।'

খেতে খেতে একেকদিন বিজনের মুখ বিষণ্ণ হয়ে যেত। বলত, 'বুঝলে বকুল, আর বোধহয় ফ্যামিলিটা বাঁচাতে পারব না। টুইশানি-ফুইশানি করে কি এত লোককে রক্ষা করা যায় !' ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ছিল সে।

আমি চুপ।

বিজন আবার বলত, 'আমার দম ফুরিয়ে আসছে। ছ্যাকরা গাড়ীর রদ্দী ঘোড়ার মতো একদিন হাড়গোড় ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়ব। আর উঠব না।'

একদিন কি দু'দিন বিজন আমাকে তাদের ভাড়া বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। তখন ওর মা'র পাগলামিটা ভীষণ বেড়ে গেছে ; পাগলামি বাড়লে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকত মহিলা।

যে দু-একদিন গেছি, বিজনের মা'র সঙ্গে দেখা হয় নি। ওর বিধবা দিদি আর তার বাচ্চাগুলোকে অবশ্য দেখেছি। ওদের বাড়ি যাওয়াতে বিজনের দিদি যে খুব খুশি হয়েছে, এমন মনে হয় নি। আমার সঙ্গে দু-একটা কথা-টথা অবশ্য বলেছে কিন্তু সারাক্ষণ কেমন যেন অপরিষ্কার সন্দেহের চোখে তাকিয়ে থেকেছে।

দেখতে দেখতে দুটো মাস ফুরিয়ে গিয়েছিল। বাবা যে পঞ্চাশটা টাকা দিয়েছিল তা থেকে দু' মাসে টিউটোরিয়ালের মাইনে চল্লিশ টাকা দিয়েছি; গাড়িভাড়া লেগেছে পাঁচ টাকা। কালীঘাট থেকে টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো পর্যন্ত হেঁটে পাঁচটা টাকা বাঁচিয়েছি। ভেবেছিলাম, দু'মাস পর বাবা আরো কুড়িটা টাকা যোগাড় করে দিতে পারবে, কিন্তু তা আর সম্ভব হয় নি। তার মানে টিউটোরিয়ালে পড়তে যাওয়া ওখানেই শেষ। আরেকটা মাস কোচিং ক্লাস করতে পারলে খুব ভাল হত। কিন্তু তা অসম্ভব।

টিউটোরিয়ালে যেতে পারব না, সে জন্য দুঃখ তো ছিলই। হঠাৎ অন্য একটা কথা ভাবতে গিয়ে আমার মন ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কথাটা হল—বিজনের সঙ্গে আর দেখা হবে না। বিজন ছাড়া কোন অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে মেশার সুযোগ আগে আর কখনও হয় নি। তার মতো অন্য কেউ আমার জীবনের কথা ওভাবে জানতেও চায় নি। বিজনের সহানুভূতি, বিজনের আন্তরিকতা এবং সরল ব্যবহার আমার মধ্যেকার ভীরু কুণ্ঠিত লাজুক একটি মেয়েকে ক্রমশ সহজ করে তুলেছিল। দুটো মাস কালীঘাট থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত পাশাপাশি হেঁটে বিজন যে আমার খুব কাছে চলে এসেছে, আগে বুঝতে পারি নি। ওর জীবনে এক ধরনের কষ্ট আছে, আমার জীবনে আরেক ধরনের। তবু পরস্পরের প্রতি অনুচ্চারিত এক সহানুভূতি আমাদের যেন একই বিন্দুতে নিয়ে যাচ্ছিল।

মনে আছে দ্বিতীয় মাসের শেষ দিনটায় বিজন আমার সঙ্গে টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো পর্যন্ত এসেছিল। সারাটা রাস্তা সে-ই কথা বলেছে; আমি মাঝে মধ্যে হুঁ-হাঁ করে গেছি। বিজনের সঙ্গে আর দেখা হবে না, এই

চিন্তাটাই আমাকে কষ্ট দিচ্ছিল।

ট্রাম ডিপোর কাছে এসে হঠাৎ যেন খেয়াল হয়েছে বিজনের। কয়েক পলক আমার দিকে তাকিয়ে থেকে সে বলেছে, 'কি ব্যপার বল তো। আজ তুমি এত অন্যমনস্ক কেন? কী হয়েছে?'

আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। বার দুই তিন মুখ তুলে তক্ষুণি নামিয়ে নিয়েছিলাম।

বিজন আমার দিকে ঝুঁকেছিল. 'কিছু বলবে?'

আস্তে করে মাথা নেড়েছিলাম।

বিজন বলেছিল, 'কী?'

মুখ আরো নিচু করে আবছা গলায় বলেছিলাম, 'কাল থেকে আমি আর টিউটোরিয়ালে আসছি না।'

বিজন চমকে উঠেছিল, 'কেন?'

আমি চুপ।

বিজন আরেকটু ঝুঁকেছিল, 'কী হল, বল—'

'বাবা আর টাকা দিতে পারবে না।' আমার ঘাড় ভেঙে মাথাটা আরো ঝুলে পড়েছিল।

তক্ষুণি উত্তর দ্যায় নি বিজন। কিছুক্ষণ পর বলেছিল, 'যেমন ক্লাস করছিলে করে যাও—'

'কিন্তু—'

'কী?'

'টাকার কী হবে?'

'সে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

আমি আবার কি বলতে যাচ্ছিলাম, এই সময় বাস এসে গিয়েছিল। একরকম তাড়া দিয়েই বিজন আমাকে বাসে তুলে দিয়েছিল। আমি উঠলে, বলেছিল, 'কাল আসবে কিন্তু—'

বাড়ি ফিরে সারারাত শুয়ে শুয়ে ভেবেছি, টিউটোরিয়ালে যাওয়া ঠিক হবে কিনা। কিন্তু পরের দিন কখন যে ফর্সা শাড়ি পরে, চুল আঁচড়ে, হাতে বই খাতা নিয়ে বাসে গিয়ে উঠেছি, নিজেই জানি না।

আরো একটা মাস যে টিউটোরিয়ালে পড়েছিলাম, তার টাকা বিজন দিয়েছিল, না টিউটোরিয়াল হোমের ম্যানেজমেণ্টকে বলে ফ্রী করিয়ে নিয়েছিল, সেসব কথা তাকে কোনদিন জিজ্ঞেস করতে পারি নি।

যাই হোক, একসময় স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা এসে গিয়েছিল। কোথায় আমার সেণ্টার পড়েছে, কথায় কথায় জেনে নিয়েছিল বিজন। তারপর কি আশ্চর্য, প্রথম দিন ইংরেজি ফার্স্ট পেপার পরীক্ষার পর টিফিনের সময় দেখি, সে গেটের কাছের দাঁড়িয়ে আছে।

পরীক্ষার সময় সব বাড়ি থেকেই লোক আসে। আমাদের বাড়ি থেকে কারো আসার সম্ভাবনা ছিল না। বাবা ভোরবেলা কাজে বেরিয়ে যায়, ফিরতে ফিরতে রাত। হাবু-গণেশরা তখন ছোট। বাকি সৎ-মা। চারটে ছেলেমেয়ে আর সংসারের জ্বালে সবসময় সে আটকে আছে। তা ছাড়া আমার লেখাপড়া সম্বন্ধে তার দারুণ বিতৃষ্ণা। কাজেই আসবে কে?

বিজনকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, সত্যিই যে সে আসতে পারে ভাবি নি। বলেছিলাম, 'আপনি!'

বিজন একমুখ হেসেছিল, 'কি রকম পরীক্ষা দিচ্ছ দেখতে এলাম।' কোশ্চেন পেপার নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কোন্ প্রশ্নের কী উত্তর লিখেছি, জিজ্ঞেস করেছিল। তারপর হঠাৎ কী লক্ষ্য করে বলেছিল, 'তোমাদের বাড়ি থেকে কেউ আসে নি?'

আস্তে করে বলেছিলাম, 'না।'

'আসবে?'

'না।'

'কিছু খেয়েছ?'

আমি চুপ। যাতায়াতের বাসভাড়া ছাড়া আর কিছুই দ্যায় নি, কিন্তু সে কথাটা বিজনকে বলা যায় নি।

প্রায় জোর করে সামনের একটা খাবারের দোকানে নিয়ে গিয়ে বিজন আমাকে মিষ্টি-টিষ্টি খাইয়ে এনেছিল।

পরীক্ষার ক'দিন রোজ টিফিনের সময় বিজন আসত; খাবার-

দোকান থেকে আমাকে খাইয়ে আনত; প্রশ্নপত্র নিয়ে আলোচনা করত। তারপর সেকেণ্ড হাফের পরীক্ষার ঘণ্টা পড়লে আমাকে হল্ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে চলে যেত।

মনে আছে শেষ পরীক্ষার দিন একটা দারুণ ব্যাপার ঘটেছিল। সেদিন ছিল একবেলার পরীক্ষা; সাড়ে বাবোটায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। হল্ থেকে বেরিয়ে দেখি বিজন দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই তার মুখ হাসিতে ভরে গিয়েছিল। অন্য দিনও হাসত সে; কিন্তু এমন উজ্জ্বল ঝকমকে আনন্দময় হাসি আগে আর কখনও দেখি নি।

বিজন বলছিল, 'পরীক্ষা কি বকম হল?'

'মোটামুটি।'

অন্য দিন কোশ্চেন পেপারটা টেনে নিয়ে ছাখে বিজন। সেদিন কিন্তু ওটার কথা তার মনেই ছিল না। প্রায় চেঁচিয়েই সে বলেছিল, 'জানো, একটা টেরিফিক সুখবর আছে।'

প্রচণ্ড আবেগের মতো কি যেন তার চোখে মুখে টগবগ করে ফুটছিল।

বিজনকে তখন যতটুকু জেনেছি তাতে মনে হয়েছে, সে খুব শান্ত চাপা ধরনের ছেলে। আবেগ-টাবেগ যত প্রবলই হোক, বিজন ঢেকে রাখতে পারত। কখনই বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়তে দিত না।

বিস্ময়ের চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেছিলাম, 'কী সুখবর?'

'আমার চাকরি হয়েছে।'

'কোথায়?'

'খবর কাগজে।'

'কোন্ কাগজে?'

একটা বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকার নাম করে বিজন বলেছিল, 'এতদিনে বাঁচলাম। এবার হয়তো ফ্যামিলিটা বাঁচাতে পারব।'

বিজনের চোখে মুখে কণ্ঠস্বরে আগের সেই নৈরাশ্য আর ছিল না। সব হতাশা কেটে গিয়ে তাকে আশ্চর্য উজ্জ্বল আর ঝলমলে দেখাচ্ছিল। একটা চাকরি যাদুকরের ছোঁয়ার মতো তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। বিজনের দিকে তাকিয়ে আমার দারুণ ভাল লাগছিল।

বিজন বলেছিল, 'চল, আজ তোমাকে খাওয়াব।'

মুখ নামিয়ে বলেছিলাম, 'রোজই তো খাওয়ান।'

'ধুর, ও আবার খাওয়া নাকি!' বিজন আমাকে চৌরঙ্গীর ওধারে একটা ভাল রেস্টুরেণ্টে নিয়ে খাইয়েছিল। তারপর নিয়ে গিয়েছিল এয়ার-কণ্ডিশান্ড্ সিনেমা হলে।

ভয়ে ভয়ে বলেছিলাম, 'সিনেমা দেখে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাবে। বাড়িতে বকবে।'

বিজন হেসেছিল, 'একটা দিন না হয় আমার জন্যে বকুনি খেলেই।'

আমি আর আপত্তি করি নি। আসলে বিজনেব কাছে থাকতে তার সঙ্গে কথা বলতে সেদিন ভীষণ ভাল লাগছিল। ওর আনন্দ চুঁইয়ে চুঁইয়ে আমার মধ্যেও খানিকটা ছড়িয়ে গিয়েছিল।

সিনেমা-টিনেমা দেখে বাইরে এসে একটা ট্যাক্সি নিয়েছিল বিজন। তখন আর রোদ-টোদ নেই ; সূর্যটাকেও দেখা যাচ্ছিল না। জলে কালি গুলে দিলে যেমন হয়, আবছা অন্ধকার বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছিল। এরই মধ্যে চৌরঙ্গীর উঁচু উঁচু বাড়ির মাথায় নানা রঙের নীয়ন জ্বলে উঠেছিল।

ঝকঝকে মসৃণ রাস্তার ওপর দিয়ে হুস করে বেরিয়ে যেতে যেতে একসময় বিজন বলেছিল, 'চাকরি বাকরি হল কিন্তু একটা কথা ভেবে আমার মন খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

'কী?'

'কাল থেকে তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না।'

আমার বুকের ভেতর দিয়ে উঁচুনীচু ঢেউয়ের মতো কি খেলে গিয়েছিল।

বিজন আবার বলছিল, 'এতদিন কোচিং ক্লাস ছিল, পরীক্ষা ছিল, তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। রোজ রোজ দেখা হয়ে একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। এখন থেকে বিকেল হলেই তোমার কথা মনে পড়বে।'

আমি চুপ। বিষাদের মতো কিছু একটা আমার বুকের ভেতর ঘন হচ্ছিল।

বিজন বলে যাচ্ছিল, 'অবশ্য একটা কাজ করলে মাঝে মধ্যে দেখা হতে পারে।'

খুব আগ্রহ নিয়ে বিজনের দিকে ফিরেছিলাম, 'কী ?'

'আমাদের বাড়ি তো তুমি চেনো ; সেখানে চলে আসতে পারো।' বলেই কি ভেবে তক্ষুণি আবার শুরু করেছিল বিজন, 'থাক, আমাদের বাড়ি যেতে হবে না। বরং আমাদের অফিসে ফোন কোরো। বলবে রিপোর্টার্স টেব্‌লে দিতে। কোথায় দেখা হবে, ফোনেই কথা বলে ঠিক করে নেব।'

কোনদিন কাবোকে ফোন করি নি ; কি ভাবে করতে হয় তাও জানি না। তবু ফিসফিস গলায় বলেছিলাম, 'আচ্ছা—'

বিজন বলেছিল, 'আমি তোমাদের বাড়ি চলে যেতে পারি। কিন্তু কেউ কিছু ভাবতে পারে।'

এদিকটা ভাবি নি। কেননা আমাদেব বাড়িতে বিজনের যাবার কথা আগে কখনও হয় নি। সত্যিই তো, যদি হঠাৎ সে চলেই যায়, আমি ভীষণ বিপদে পড়ব। বিজন কে, কেন এসেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি হাজারটা প্রশ্ন করে সৎ-মা আমার আলজিভ বার করে ছাড়বে। যাই হোক আমি চুপ করে ছিলাম।

একটু নীরবতা। তারপর বিজন আবার বলেছিল, 'পরীক্ষা-টরীক্ষা তো হয়ে গেল। এখন মার্চ মাস, রেজাল্ট বেরুবে সেই জুলাই-এর গোড়ায়। এই তিনটে মাস কি করবে ?'

প্রতিধ্বনির মতো করে বলেছিলাম, 'কি করবে ?'

'তিন মাস চুপচাপ বসে না থেকে টাইপের স্কুলে ভর্তি হয়ে যাও না। যা দিনকাল টাইপটা শিখে রাখা ভাল ; এটা একস্ট্রা কোয়ালিফিকেশন। তোমাদের ফ্যামিলির কথা তো শুনেছি ; হয়তো তোমাকে চাকরি-বাকরি নিতেও হতে পারে।'

বিজন ভাল পরামর্শই দিয়েছিল। কিন্তু তক্ষুনি আবার মনে পড়ে গিয়েছিল, টাইপ স্কুলে ভর্তি হতে হলে টাকার দরকার। আমার পরীক্ষার ফী এবং টিউটোরিয়ালের মাইনে মিলিয়ে গুচ্ছের টাকা খরচ হয়েছে। তারপরও কি বাবা টাইপ স্কুলে ভর্তি করে দিতে রাজী হবে ? দ্বিধার গলায় বলেছিলাম, 'দেখি—'

আমার মনোভাব চট করে বুঝে নিয়ে বিজন বলেছিল, 'টালিগঞ্জ রেল ব্রীজের কাছে আমার এক বন্ধুর টাইপ স্কুল আছে। তোমাকে ওখানে ফ্রী শিখবার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।'

একটু ভেবে বলেছিলাম, 'বাবাকে বলে দেখব।'

'তোমার বাবা রাজী হলে কাল তিনটে থেকে চারটের মধ্যে আমার অফিসে ফোন কোরো।'

'আচ্ছা—'

বাড়ি ফিরে বাবাকে টাইপ শেখার কথা বলতেই বাবা জিজ্ঞেস করেছিল, 'টাইপ শিখা কী হইবে?'

'যদি একটা চাকরি পাই—'

বাবা নড়ে-চড়ে বসে ছিল, 'চাকরি! তা হইলে তো খুবই ভাল হয়; সংসারের যা অবস্থা!' একটু থেমে আবার বলেছিল, 'কেউ আশা-টাশা দিছে নাকি?'

চোখ কান বুজে জলে ঝাঁপ দেবার মতো করে বলেছিলাম, 'হ্যাঁ।'

বিজনের সঙ্গে দেখা হবে; সেই জন্যই আমার টাইপ শিখতে যাওয়া। কিন্তু বাবা যদি জিজ্ঞেস করত কে আশা দিয়েছে, তার সঙ্গে কোথায় কি ভাবে আলাপ হয়েছে, দারুণ বিপদে পড়ে যেতাম। কেননা একটা মিথ্যের মেরুদণ্ড শক্ত রাখতে আরো দশটা মিথ্যে বলতে হত। আমি আবার গুছিয়ে-টুছিয়ে মিথ্যে বলতে পারি না, নির্ঘাত ধরা পড়ে যেতাম।

বাবা কিন্তু তার ধার দিয়েই যায় নি। সংসারের চাপে তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। আমি চাকরি পেলে সহজভাবে নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে, এতেই সে খুশি। বলেছিল, 'টাইপ শিখতে মাসে কত কইরা লাগব?'

'কিচ্ছু লাগবে না। খালি টালিগঞ্জ রেল ব্রীজ পর্যন্ত যাতায়াতের ভাড়াটা যদি দাও—'

'ঠিক আছে, দিমু—'

সৎ-মা একটু দূরে দাঁড়িয়ে চুপচাপ সব শুনে গিয়েছিল। বিয়ের পর থেকেই আমার সম্বন্ধে সৎ-মার দারুণ বিদ্বেষ। লক্ষ্য করেছিলাম, চাকরির কথায় তার মুখে বিদ্বেষের সেই রেখাগুলো ধীরে ধীরে কেমন

নরম হয়ে যাচ্ছে।

মনে আছে সেই দিনই তিনটের সময় পোস্ট অফিসে গিয়ে বিজনকে ফোন করেছিলাম। নিজে করেছিলাম বললে ঠিক হয় না; পোস্ট অফিসের একটা লোককে বিজনের ফোন নম্বর দিয়ে ধরে দিতে বলেছিলাম।

জীবনে সেই আমার প্রথম ফোন করা। ' রিসিভারটা কানে লাগিয়ে বিজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে টের পাচ্ছিলাম, আমার হাত-পা ভীষণ কাঁপছে।

বিজন বলেছিল, 'এক কাজ করতে পারবে?'

'কী?'

'ছ'টার সময় চারু মার্কেটের উল্টোদিকের ফুটপাথে থেকো। আমি আসছি।'

'আচ্ছা।'

সেই দিনই টাইপ স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। সেখানে একটা ফোন ছিল; রোজ তুপুরবেলা তুটোর সময় বিজন ওর অফিস থেকে আমার সঙ্গে কথা বলত। তখন ও সাধারণ একজন রিপোর্টার। যেদিন কোন এ্যাসাইনমেণ্ট নিয়ে কলকাতার বাইরে যেত সেদিন অবশ্য কথা বলা হত না। মাঝে মাঝে এক-আধদিন টাইপ শেখার পর বিজন আমাকে কার্জন পার্কে চলে যেতে বলত। রাজভবনের উল্টোদিকে যেখানে ক্যাকটাস ঝোপের তলায় গাদা গাদা ইঁত্বর থাকে, আমি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতাম। ওটাই ছিল আমাদের দেখা করবার জায়গা। বিজন অফিসে ম্যানেজ করে সোজা ওখানে চলে আসত।

কোনদিন বিজন আমাকে নিয়ে যেত গঙ্গার ধারে; যেখানে জলচর বিরাট বিরাট জাহাজ নোঙর করে আছে। আমরা ঘাসের ওপর পাশাপাশি বসে আবোল-তাবোল গল্প করে যেতাম, মশলা মুড়ি কি আলু কাবলি খেতাম বা ঘাসের ডগা ছিঁড়ে দাঁতে কাটতাম। কোনদিন আমরা যেতাম দক্ষিণেশ্বর বা বটানিক্সে। কোনদিন সোজা এয়ার কণ্ডিশান্ড্ সিনেমা হলে।

যে দিন বিজনের সঙ্গে দেখা করতাম, সেদিন, বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যেত। সৎ-মা কি বাবা যদি জিজ্ঞেস করত, 'এত দেরি হল কেন?' মুখ নিচু করে বলতাম, 'চাকরির ব্যাপারে একটু যেতে হয়েছিল।' এই ডাহা মিথ্যেটা বিজনই আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল। বাবা কি সৎ-মা এর পর আর কিছু জানতে চাইত না।

জুলাই মাসের শেষে রেজাল্ট বেরুল। আমি সেকেণ্ড ডিভিসনে পাশ করেছিলাম।

বিজন বলেছিল, 'এবার কী করবে? কলেজে ভর্তি হবে তো?'

বাড়ির অবস্থা ক্রমশ খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। বলেছিলাম, 'না।'

'তবে কী করতে চাও?'

'একটা চাকরির ভীষণ দরকার। চাকরি হলে নাইট ক্লাস করার কথা ভাবব।

একটু চুপ করে থেকে বিজন বলেছিল, 'চাকরির ব্যাপারে তুমি তা হলে খুব সীরিয়াস?'

'নিশ্চয়ই। বাবা যে কাজ করে তার কোন সিকিউরিটি নেই। সংসারকে রক্ষা করতে হলে আমাকে চাকরি করতেই হবে।'

'দেখ, খবরের কাগজের সোর্সে কিছু কিছু ইনফ্লুয়েনসিয়াল লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। আমি তা হলে চেষ্টা করে দেখি।'

'আচ্ছা।'

'তিন মাস তো টাইপ করছ। কি রকম স্পীড হয়েছে?'

'পঁচিশ তিরিশের বেশি হবে না।'

'আরেকটু খেটে ওটা ফরটি-টরটির মতো করে ফেল। আর একটা কাজ করতে হবে।'

'কী?'

'এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে একটা কার্ড করিয়ে নেবে। কালই করিয়ে নাও।'

'এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কোথায়?'

রগড়ের গলায় বিজন বলেছিল, 'নাঃ, তোমাকে দিয়ে কিছু হবে

না দেখছি। বাঙালাদেশের ইয়াং মেয়ে হয়ে এখনও এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চেনো না!'

একপলক বিজনের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিলাম, 'আহা, আমি যেন আগে কত চাকরি-বাকরির চেষ্টা করেছি!'

'ঠিক আছে; কাল সকাল ছ'টার সময় চারু মার্কেটের উল্টোদিকের বাস-স্টজেজে দাঁড়িয়ে থেকো। আমি তোমাকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নিয়ে যাব।'

আরো ছ'মাস পর আমার টাইপের স্পীড পঁয়তাল্লিশ উঠলে চাকরি হয়েছিল। (সেই চাকরিই এখনও করে যাচ্ছি)। বিজনই অনেক ধরাধরি ছোটাছুটি করে ওখানে আমাকে ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

চাকরি হবার পর বিজন বলেছিল, 'এবার নাইট কলেজে ভর্তি হয়ে যাও।'

সাউথ ক্যালকাটার একটা কলেজে ভর্তি হয়েও ছিলাম। কিন্তু চাকরি করা, বাস জার্নি এবং কলেজ—একসঙ্গে তিনটে চালাতে গিয়ে শরীর ভেঙে পড়ছিল। এক বছর কলেজ করে শেষ পর্যন্ত ছেড়েই দিলাম।

চাকরি হবার পর বিজনের সঙ্গে আবার আগের মতো রোজ দেখা হতে লাগল। টিফিনের সময় অফিস পালিয়ে টুক করে ও ডালহৌসি চলে আসত। এক-আধদিন আসতে না পারলে আমিই এসপ্ল্যানেডের কাছে ওর অফিসে চলে যেতাম।

যাই হোক আমি চাকরি পাবার পর বিজনরা টালিগঞ্জের বাড়ি ছেড়ে ব্যারাকপুর চলে গিয়েছিল। এদিকে আমাদের সংসারের অবস্থাও কিছু ফিরেছিল। সহজভাবে নিঃশ্বাস ফেলতে পারছিল! সৎ-মার ব্যবহারও গিয়েছিল বদলে। আগে আগে আমাকে দিয়ে সংসারের যাবতীয় কাজ করিয়ে নিত সে। চাকরি পাবার পর বিশেষ কিছু করতে দিত না। একটু-আধটু যত্নও করতে শুরু করেছিল। ছুটির দিনে আমাকে কাছে বসিয়ে বলত, 'চুলগুলোর কি অবস্থা করেছিস বল্ তো; একেবারে জট পাকিয়ে গেছে।' চুল খুলে তালুতে ভাল করে তেল

ঘষে, চিরুনি দিয়ে জট ছাড়িয়ে কোনদিন খোঁপা বেঁধে দিত ; কোনদিন বা বেণী।

আমি চাকরি পাবার আগে হাবু-গণেশরা স্কুলে পড়ত ঠিকই তবে মাইনে দিতে না পারার জন্য প্রায়ই নাম কাটা যেত। বছরে দু'মাসও ওরা ক্লাস করতে পারত কিনা সন্দেহ ; বাকি সময়টা রাস্তায় ঘুরত। হাবুটা তো তখন থেকেই চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিতে আর সিগারেট টানতে শুরু করেছে।

আমি চাকরি পাবার পর স্কুলের মাইনে নিয়মিত দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু ততদিনে না পড়ে পড়ে ওদের অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে। গণেশটা তবু পি. ইউ. পর্যন্ত পড়েছে। কিন্তু হাবু আর বাচ্চু ক্লাস সেভেন এইটে উঠেই পড়া ছেড়ে দিয়েছিল। নীলিমাও তাই।

দেখতে দেখতে ক'টা বছর কেটে গিয়েছিল। তার মধ্যে জল-হাওয়া এবং আলোর মতো বিজন কখন যে আমার কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, মনে নেই। ওকে বাদ দিয়ে আমার অস্তিত্বই যেন অর্থহীন। বিজন প্রথম থেকেই আমাকে 'তুমি' বলত। আমি কখন 'তুমি' বলতে শুরু করেছিলাম, মনে পড়ে না। তেমনি মনে পড়ে না বিজন কবে বলেছিল, 'এভাবে আর চলে না—'

'কি ভাবে ?' আমি তার চোখের ভেতর তাকিয়েছিলাম।

'এই দিনে একবার দেখা করে, সিনেমা দেখে, রেস্তোরাঁয় খেয়ে। এভাবে সারা জীবন চালানো যায় না, বুঝলে ?'

হেসে ফেলেছিলাম, 'কি ভাবে চালাতে চাও ?'

বিজন বলেছিল, 'তুমি কি কিছুই 'ফীল' কর না ?'

বিজন কী বলতে চেয়েছে তক্ষুণি বুঝেছি। মুখ নামিয়ে আঁচলে আঙুল জড়াতে জড়াতে বলেছিলাম, 'কিন্তু—'

'কী ?'

এক পলক বিজনের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিয়েছিলাম, 'না, কিছু না।'

বিজন এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল, 'আসছে সপ্তাহে আমি কিন্তু

ম্যারেজ রেজিস্টারের অফিসে নোটিশ দেব।'

একটু মজা করতে ইচ্ছে হয়েছিল। ঠোঁট টিপে খুব আস্তে বলেছিলাম, 'বাব্বা, দারুণ তাড়া দেখছি।'

'হ্যাঁ, তাড়াই। বয়েস বাড়ছে তো। এবার লাইফে সেটেল্ড হওয়া দরকার।'

'কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখেছ?'

'কী?'

'তোমার আমার ফ্যামিলি।'

'ফ্যামিলি, ফ্যামিলি, ফ্যামিলি!' বিজনকে ক্রুদ্ধ, অসন্তুষ্ট এবং বিরক্ত দেখিয়েছিল, 'ফ্যামিলির দিকে তাকিয়ে থাকলে এ জন্মে আর বিয়ে করা হবে না। সে যাক, নোটিশ দেবার কথাটা মনে রেখো।'

'আচ্ছা।'

কিন্তু সেবার নোটিশ দেওয়া হয়নি। কেননা সেদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখি হুলুস্থুল কাণ্ড। নীলিমাকে পাওয়া যাচ্ছে না। সেই সঙ্গে পাশের কলোনির একটা ছেলেকেও, নির্মল তার নাম। দু'জনে উধাও হয়েছে।

থানা-পুলিশ-হাসপাতাল—সাতদিন সারা কলকাতা তোলপাড় করে ফেলা হল। তারপর পুলিশই ভবানীপুরে এক বস্তি থেকে দু'জনকে খুঁজে বার করেছিল; আর পুলিশের কাছে মুচলেকা দিয়ে বাবা ওদের বাড়ি নিয়ে এসেছিল। নীলিমারকপালে সিঁথিতে তখন সিঁদুর; ওদের বিয়ে হয়ে গেছে।

ওদের দেখে হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসেছিল সৎ-মা। সাত দিন ধরেই সমানে কেঁদেছে সে; কিন্তু সেদিনের কান্নাটা যেন হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছিল। খুব সম্ভব মেয়ের বিয়েটা এমন কেলেঙ্কারির মধ্যে হবে সে ভাবতে পারে নি। বাবা কিন্তু কোন রকম মন্তব্য করে নি; এভাবে বিনা খরচায় মেয়ে পার হয়ে যাওয়াতে হয়তো খুশিই হয়ে থাকবে। হাবু আর বাচ্চুও কিছু বলে নি। শুধু গণেশটাই চিমটি কাটার মতো করে নীলিমাকে বলেছিল, 'খুব খেল্ দেখালি!' নীলিমা

উত্তর ছ্যায় নি। গণেশ আবার বলেছিল, 'তোর একটু লজ্জাও করল না রে নীলি। দিদিটার এখনও বিয়ে হল না; আর তুই কিনা লটকে পড়লি! কপালে মার্কারি ল্যাম্প জ্বালিয়ে দিদিটা এখন তোদের দিকে তাকিয়ে থাক।'

পুলিশের হাত থেকে সেই যে ছাড়িয়ে আনা হয়েছিল তার পর পুরো ছ'টা মাস নীলিমা আর নির্মল আমাদের এখানেই ছিল। কেননা নির্মলেব বাবা এরকম একটা কেলেঙ্কারির পর ছেলে আর ছেলের বৌকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে নি। অবশ্য ছ'মাস পর ব্যাপারটা সহজ হয়ে এসেছিল; নির্মলের বাবা একদিন আমাদের বাড়ি এসে নীলিমাদের নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু স্থায়ীভাবে শ্বশুরবাড়ি থাকা নীলিমার কপালে ছিল না। কারণ নির্মল ফ্যাক্টরিতে টেম্পোবারি কাজ করত। মাসে পনের দিনের মতো তার কাজ, বাকি পনের দিন সে বেকার। যে ক'দিন নির্মল মাইনে পেত মাত্র সে ক'দিনই শ্বশুরবাড়ি থাকতে পেত নীলিমা। নির্মলের কাজ বন্ধ হলেই ছু'জনে আমাদের বাড়ি চলে আসত। এখনও তাই চলছে।

নীলিমার ওই ঘটনাটার জন্য সেবার ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে নোটিশ দেওয়া হয় নি। তার মাস কয়েক বাদে বিজন আবার ক্ষেপে উঠেছিল, 'এবার কিন্তু নোটিশ দিচ্ছি।'

একটু চুপ করে থেকে বলেছিলাম, 'আচ্ছা—'

নোটিশ দেবার ছু' সপ্তাহ পর বিয়ের দিন ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু সেদিন যাই নি। আমার ভীরুতা আমার দ্বিধাই যেতে ছ্যায় নি। পরের দিন আমার অফিসে এসে বিজন জানিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, আমার সঙ্গে আর কোনরকম সম্পর্ক রাখবে না। কিন্তু একটা মাস যেতে না যেতেই আবার বিয়ের দিন ঠিক করে ফেলেছিল। এই দ্বিতীয় তারিখেও যাই নি। বিজন আবার প্রতিজ্ঞা করেছিল, জীবনে আমার মুখ দেখবে না। আমার সঙ্গে তার সম্পর্কের ওখানেই শেষ। কিন্তু তারও মাস কয়েক পর আজ আমাদের বিয়ে হয়ে গেল।

এখন কত রাত, কে জানে। চাঁদটা আকাশের মাঝ-মধ্যিখান থেকে ডান ধারে হেলে গেছে। আমি আর তাকিয়ে থাকতে পারছি না : চোখ দুটো দ্রুত জুড়ে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যে গাঢ় গভীর ঘুমে ডুবে যেতে লাগলাম।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে গেল। গণেশটা এখনও নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। দারুণ ঘুমোয় ছেলেটা ; ন'টার আগে তাকে তোলে কার সাধ্য।

ঘুম ভাঙবার পরও অনেকক্ষণ শুয়ে থাকলাম। চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল আসার মতো কাল দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত যত ঘটনা চোখের সামনে এসে যেন জমা হতে লাগল। শ্যামবাজারের অন্ধ গলিতে সেই ম্যারেজ রেজিস্ট্রেসন অফিস, বিজন, সুধীর, নিখিল, চিন্ময়, পাকপাড়ায় সুধাময়দের বাড়ি, বিজলী, হৈ-হুল্লোড়, সুধাময়দের বাড়িতে ফুল দিয়ে সাজানো সেই ঘর—সব কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হতে লাগল। তবু ভালতো সুখের মতো কালকের দিনটাকে সারা গায়ে জড়িয়ে রাখলাম।

কিন্তু ঘুম ভেঙে গেলে কতক্ষণ আর শুয়ে থাকা যায়? মশারি খুলে, বিছানা-টিছানা গুটিয়ে ঘরের বাইরে এসে দেখি বেশ রোদ উঠে গেছে—শরতের নরম সোনালী রোদ।

সৎ-মা উনুনে আঁচ দিয়ে রান্নাঘরে আনাজ কাটছিল। বাবা বারান্দায় বসে নিমের ডাল দিয়ে দাঁতন করছিল। আমি তাড়াতাড়ি কলতলা থেকে মুখ-টুক ধুয়ে এসে উনুনে চায়ের জল চাপিয়ে দিলাম। সকাল-বেলার চা-টা আমিই করি।

চা হয়ে গেলে কাপে করে সৎ-মাকে দিলাম, বাবাকে দিলাম।

আমার ঘরে গিয়ে গণেশকে দিয়ে এলাম ; বালিশ থেকে কোনরকমে মাথাটা তুলে এক চুমুকে চা শেষ করে আবার ঘুমিয়ে পড়ল গণেশ। তারপর বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে গেলাম ছাদে। ছাদের ঘরে বাচ্চু আর হাবু থাকে, বাচ্চুটা এখন নেই ; সকালে উঠেই কোথায় বেরিয়ে গেছে। হাবু অবশ্য আছে। আমাকে দেখেই সে উঠে বসল ; তুড়ি দিয়ে দিয়ে হাই তুলতে লাগল। হাইয়ের সঙ্গে তার মুখ থেকে ভক করে বোটকা দুর্গন্ধ বেরিয়ে এল।

এই গন্ধটা আমাব চেনা ; ওটা পচা দিশী মদের গন্ধ। সকালবেলা যে ওর ঘরে ঢুকবে সে-ই এই গন্ধটা পাবে। হাবুটা একেবারে গোল্লায় গেছে। তাড়াতাড়ি চায়ের কাপটা বিছানার একধারে রেখে বেরিয়ে এলাম।

বাবা আটটায় বেরিয়ে যায়, আমি ন'টায়। নিচে নেমে দেখি, অফিসেব ভাত দেবাব জন্য সৎ-মা তাড়াহুড়ো লাগিয়ে দিয়েছে। যতটা পারি হাতে হাতে তাকে সাহায্য করতে লাগলাম।

একসময় নাকে মুখে ভাত-ডাল গুঁজে বাবা বেরিয়ে গেল। তারও ঘণ্টাখানেক বাদে আমিও বড় রাস্তায় গিয়ে ডালহৌসির বাস ধরলাম।

কিন্তু টালিগঞ্জ ট্রামডিপো পেরুতেই বাসটা জ্যামের মধ্যে পড়ে গেল। ঠেলা-রিক্‌শা-প্রাইভেট কার-ট্রাম-ট্যাক্সির জট ছাড়িয়ে বেরুতে বেরুতে অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেল। অফিসে যখন পৌঁছুলাম, তখন এগারটা। তার মানে ঝাড়া এক ঘণ্টা লেট।

সাততলা প্রকাণ্ড একটা বাড়ির থার্ড ফোর্থ এবং ফিফথ্‌ ফ্লোর নিয়ে আমাদের অফিস। আমি ফোর্থ ফ্লোরের কোণের দিকের একটা ঘরে কনক, পূর্ণিমা, স্টেলা—এমনি দশটা মেয়ের সঙ্গে বসি। এই ঘরটা আমাদের টাইপ সেকসান। স্টেলা এই সেকসানের ইন-চার্জ।

লিফ্‌টে ওপরে উঠে আমাদের সেকসানে যেতেই চোখে পড়ল স্টেলা তার সীটে নেই। খুব সম্ভব আজ অফিসে আসে নি কিংবা অন্য কোন ডিপার্টমেন্টে গেছে। পূর্ণিমারা মেরুদণ্ড টান করে টাইপ করে যাচ্ছে। আর কনক কার সঙ্গে যেন ফোনে কথা বলছে। আমাকে দেখে চোখে

চোখে হাসল কনক ; হাতের ইশারায় কাছে ডাকল।

কাছে যেতেই ফোনে মুখ রেখে অদৃশ্য শ্রোতাটির উদ্দেশ্যে দারুণ মজা করে করে বলতে লাগল, 'যার জন্যে আপনার হার্টফেল হয়ে যাচ্ছিল সে এসে গেছে। তার সঙ্গে কথা বলুন—' তারপর টেলিফোনটা আমার হাতে দিয়ে বলল, 'তোর ফোন। কথা বল্—'

মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছি, বিজনই ফোন করেছে। কিন্তু এ সময় তো কখনও সে ফোনে ডাকে না। বিমূঢ়ের মতো কনককে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে রে?'

কনক হেসে হেসে বলল, 'কে আবার, তিনিই। দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে এই নিয়ে বার চারেক ফোন করল।'

বিজনকে আমার বন্ধুরা সবাই চেনে। আমিও ওদের বন্ধুদের চিনি। যাই হোক, একটা ঘণ্টায় চারবার ফোন করার কারণ কী? কিছুটা ভয়ে ভয়ে ফোনটা কানে তুলে বললাম, 'আমি বকুল—'

ওপার থেকে বিজনের গলা ভেসে এল, 'কি ব্যাপার, সেই দশটা থেকে ফোন করছি। তোমার পাত্তা নেই।'

'আমার আসতে লেট হয়েছে।'

'কেন?'

'রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম ছিল।'

এবার বিজনের কণ্ঠস্বর বিরক্ত শোনাল, 'কলকাতার এই এক ঝঞ্ঝাট। এখানে বাস করা ইম্‌পসিবল্—'

বললাম, 'কী জন্যে ফোন করেছিলে?'

'কাল রাত্তিরে ঠিকমতো পৌঁছুতে পেরেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'বাড়িতে বিয়ের কথা জানিয়েছ?'

'সারারাত বুঝি আর ঘুমোও নি ; শুধু এ-ই ভেবেছ—'

'জানিয়েছ কিনা, তা-ই বল না—'

'না।'

'কেন?'

'এটা কি 'কাটলেট খাওয়া' 'সিনেমা দেখা'র মতো ব্যাপার যে বললেই হয়ে গেল! সুযোগ-টুযোগ করে জানাতে হবে।'

'দয়া করে সেই সুযোগটা একটু তাড়াতাড়ি করে নাও।'

'আচ্ছা।'

একটু চুপ করে থেকে আবার বললাম, 'শুধু এইটুকু বলবার জন্যে এক ঘণ্টায় চারবার ফোন করেছ?'

বিজন বলল, 'না। আজ দেড়টার ফ্লাইটে আমি বম্বে যাচ্ছি।'

'কই, কাল কিছু বল নি তো!' আমি অবাক হয়ে গেলাম।

বিজন বলল, 'কাল যাবার ঠিক ছিল না। আজ অফিসে আসতেই নিউজ এডিটর প্লেনের টিকিট হাতে ধরিয়ে দিলেন—'

'হঠাৎ বম্বেতে?'

'ওখানে ট্রম্বে বলে একটা জায়গা আছে জানো তো?'

'যেখানে এ্যাটমিক প্ল্যাণ্ট আছে?'

'হ্যাঁ। এ্যাটমিক কমিশনের ইনভাইটেসনে একটা বিরাট কনফারেন্স হচ্ছে। আমাকে সেটা কভার করতে হবে।'

'ফিরবে কবে?'

'সাতদিন পর। আজ বুধবার; নেক্সট বুধবার আমাকে ক্যালকাটায় এক্সপেক্ট করতে পারো।'

'ওখানে পৌঁছে একটা চিঠি দিও।'

'আচ্ছা।'

একটু চুপ।

তারপর বিজন আবার বলল, 'সাত সাতটা দিন হাতে পেলে। এর ভেতর বিয়ের কথাটা বাড়িতে জানাবে।'

'ঠিক আছে।'

বিজন লাইন কেটে দিল। ফোনটা রেখে আমি নিজের সীটে গিয়ে বসলাম। আমার পাশেই বসে কনক, তারপর পূর্ণিমা, তারপর মাধবী, স্বপ্না, মঞ্জু, অরুণা, ডরোথি আমাদের এই 'টাইপ সেকসান'টা বিশুদ্ধ প্রমীলা রাজ্য।

সীটে বসে প্রথমে এক গেলাস জল খেলাম ; তারপর এ্যাটেনডান্সের খাতায় সই করে মুখ তুলতেই কনকের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল।

কনকের বয়েস আমারই মতো। গোলগাল মুখ, ভাসা ভাসা বড় চোখ, সুন্দর সাজানো দাঁত—সব মিলিয়ে মেয়েটা ভারি সুশ্রী ; তাকে ঘিরে আলগা একটু চটকও রয়েছে।

কনক হাসছিল। বলল, 'সাত দিন! বাবা, এ যে অনেক অনেক দিনের বিরহ।'

উত্তর দিলাম না।

কনক আবার বলল, 'রোজ রোজ দেখা হওয়ার চাইতে মাঝে মাঝে ইণ্টারভ্যাল দেওয়া ভাল। তাতে চার্ম বাড়ে। না কি বলিস ?'

এবারও কিছু বললাম না। একটু হেসে টাইপ-রাইটারের ঢাকনা খুলে কাগজ আর কার্বন পব পর সাজাতে লাগলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে খট খট আওয়াজে টাইপ সেকসানে ঝড় বয়ে যেতে লাগল।

হঠাৎ একসময় কনক ডাকল, 'এই বকুল—'

তাকালাম।

চোখ আধবোজা করে ঠোঁট টিপে অদ্ভুত হাসল কনক।

আমার চোখ কুঁচকে গেল, 'হাসছিস যে ?'

চট করে চারদিক দেখে নিয়ে নিচু গলায় কনক বলল, 'একটা দারুণ খবর আছে।'

'কী ?'

'এখন না, পরে বলব। কখন তোর সময় হবে বল্‌ত—'

'টিফিনে।'

'তখন আবার তোর 'লাভার' আসবে। সে এলে তোকে তো আর পাওয়া যায় না।'

আমাদের বিয়েব কথা কনককে জানাই নি। কনক যদি টের পেত শুধু কি 'লাভার' বলত ? এতক্ষণে নানারকম রগড়ের কথা বলে, মজার মজার অশ্লীল ঠাট্টা করে আমাকে পাগল করে ছাড়ত।

বললাম, 'শুনলি তো সে বম্বে যাচ্ছে। আজ দেড়টায় তার প্লেন। এখন সাতদিন আমি স্বাধীন ; যখন যেখানে খুশি আমাকে নিয়ে যেতে পারিস।'

'ভেরি গুড।'

টিফিনের সময় আমাকে অফিসের ক্যানটিনে নিয়ে গেল কনক। নিরিবিলি একটা কোণ দেখে দু'জনে মুখোমুখি বসলাম। কনক বলল, 'কী খাবি ?'

'তোর যা খুশি বলে দে না—'

একটু পর চা টোস্ট আর অমলেট এলে খেতে খেতে বললাম, 'এবার তোর দারুণ খবরটা বল্—'

তক্ষুণি উত্তর দিল না কনক। চামচ দিয়ে অন্যমনস্কের মতো অমলেট কাটতে কাটতে কিছুক্ষণ কি ভাবল। তারপর হেসে হেসে নিচু গলায় বলল, 'আমি ভাই ফেঁসে গেছি।'

বোকাটে মুখে প্রতিধ্বনি করলাম, 'ফেঁসে গেছিস ! তার মানে ?'

'তার মানে আমার সেজদির পিসতুতো দেওরের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ভদ্রলোক এতদিন লণ্ডনে ছিল, মাসখানেক হল দেশে ফিরেছে।'

'তোর সঙ্গে কবে আলাপ হল ?'

'লণ্ডন থেকে ফেরার পরই।'

'কই বলিস নি তো—'

'তখন বলার মতো কিছু ছিল না।'

'এখন হয়েছে বুঝি ?'

'হ্যাঁ—' কনক মাথা হেলিয়ে দিল। তার চোখে-মুখে খুব দ্রুত ঢেউয়ের মতো কী খেলে যেতে লাগল।

আমি ঝুঁকলাম, 'কদ্দুর এগিয়েছিস বল্—'

'এই খানিকটা—'

'কতটা ?'

'পাসপোর্ট পর্যন্ত।'

'সে আবার কী!'

'বা রে, লণ্ডন যেতে হলে পাশপোর্ট-টাশপোর্ট করতে হবে না?'

চমকে উঠলাম, 'তা হলে কি—'

ঠোঁট টিপে আলতো করে হাসল কনক। বলল, 'ঠিক ধরেছিস; আমরা বিয়ে করছি। আজ হচ্ছে বারো তারিখ; মাসের শেষ দিকে আমাদের বিয়ে। তার পনের দিন পর লণ্ডন পাড়ি দিচ্ছি।'

'তার মানে আর মোটে একটা মাস কলকাতায় আছিস?'

'হ্যাঁ। অরুণের আর বেশি ছুট নেই যে।'

'ভদ্রলোকের নাম বুঝি অরুণ?'

'হ্যাঁ।'

একটু ভেবে বললাম, 'এই সেদিন আলাপ হল; আলাপের দেড় মাসের মাথায় বিয়ে; বিয়ের পনের দিন পর প্লেনে উঠবি। তোর সবই দেখছি ঘোড়ায় জিন দিয়ে।'

হেসে হেসে কনক বলল, 'আমি কি তোর মতো? বারো বছর ধরে ঝুলে থাকব! পাতে খাবার সাজিয়ে আমি বাপু হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না।'

আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছিল, বেশি ওস্তাদি করিস না কনক। আমিও বিয়ে করেছি, কিন্তু কিছুতেই বলতে পারলাম না।

একটু চুপ করে থেকে গাঢ় গলায় কনক বলল, 'অরুণ ছেলেটা ভারি সরল রে। মনে হচ্ছে এবার আর ভুল করি নি।'

হকচকিয়ে গেলাম। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে, কনকটা খুব হাসিখুশি আর হুল্লোড়বাজ মেয়ে। কিন্তু ওর ভেতরে দারুণ দুঃখের একটা জায়গা আছে। ক'বছর আগে আরেকবার বিয়ে হয়েছিল ওর; সেই প্রথম বিয়েটা সুখের হয় নি, দু বছরের মধ্যেই ডাইভোর্স হয়ে গিয়েছিল।

কনক আবার বলল, 'এবার আমি সুখী হব বকুল, তুই দেখিস।'

হঠাৎ সহানুভূতিতে আমার মন ভরে গেল। কনকের কাঁধে একটা হাত রেখে গভীর গলায় বললাম, 'নিশ্চয়ই সুখী হবি।'

একটু কি ভেবে কনক বলল, 'একটা কথা বলব ?'

'বল্ না—'

খুব আন্তরিকতার সঙ্গে কনক বলল, 'অনেকদিন হয়ে গেল ; এবার তোরা বিয়েটা করে ফেল।'

উত্তর দিলাম না। কনকের জন্য এক ধরনের সহানুভূতি আমার বরাবরই আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে তার পাশাপাশি অদ্ভুত এক হিংসে আমার রক্ত-মাংস পুড়িয়ে দিতে লাগল। ও যদি স্বামী নিয়ে ঘর-সংসার করতে পারে, আমিও পারব। নিশ্চয়ই পারব। কনক জানে না, তার দ্বিতীয় বিয়ের কথাটা বলে সে আমার সাহস কতখানি উস্কে দিয়েছে।

বিজন সাতদিন সময় দিয়ে গেছে ; তার ভেতর বিয়ের কথাটা বাড়িতে জানিয়ে দিতে হবে। কিন্তু কাকে জানাব ? মরে গেলেও বাবাকে বলতে পারব না। সৎ-মাকে বলাও সম্ভব না। আমার ধারণা, ওদের বললে একটা তুমুল কাণ্ড ঘটে যাবে। তিরিশ বছর বয়েস হল, এর মধ্যে বাবা আমার বিয়ের চেষ্টা করে নি। চেষ্টা দূরের কথা, বিয়ের নাম পর্যন্ত মুখে আনে নি। আমি জানি ওরা চায়, চিরকাল এই সংসার টেনে যাই। এখান থেকে বেরুতে চাইলে ওরা বাধা দেবেই।

বাবা আর সৎ-মাকে বাদ দিলে থাকে বাচ্চু, গণেশ আর হাবু। বাচ্চু আর হাবু যে ধরনের ছেলে, ওদের বলা যায় না। একমাত্র গণেশকেই বলতে পারি। আমার ওপর চিরদিনই ওর খুব টান। এ বাড়ির এতগুলো মানুষের মধ্যে ও-ই যা আমার কথা একটু ভাবে। মাঝে মাঝে আমার বিয়ের কথাও বলে কিন্তু কেউ কানে তোলে না।

গণেশের কাছে বিয়ের কথাটা কি ভাবে বলব, ভাবতে ভাবতে চারটে দিন পেরিয়ে গেল। হাতে আছে এখন শুধু তিনটে দিন—অর্থাৎ আজ, কাল আর পরশু। তারপর বিজন ফিরে আসবে। যেভাবেই হোক, আজ কালেব ভেতর খবরটা জানিয়ে দিতে হবে। গণেশকে বললেই পাঁচ মিনিটের ভেতর এ বাড়ির সবাই জেনে যাবে। তারপর যা একখানা কাণ্ড হবে, ভাবতে গিয়ে আমার মাথাব ভেতর চাকা ঘুরতে থাকে। তবু আজ হোক কাল হোক, যখন বলতেই হবে তখন আগে-ভাগেই বলে ফেলা ভাল। তাতে ওরা হাতে খানিকটা সময় পাবে।

বিয়ের দিন থেকে গণেশটা আমার ঘরে শুচ্ছে। আজ অফিস থেকে ফিরে রাত্তিরে ওকে বলব।

কিভাবে কেমন করে গণেশের কাছে শুরু করব, সকাল থেকে ভাবতে লাগলাম। ভাবতে ভাবতেই অফিসে চলে গেলাম। চোখ কান বুজে একবার আরম্ভ করতে পারলে অবশ্য বলে ফেলতে পারব। কিন্তু আরম্ভটাই যে অসম্ভব ব্যাপার।

অন্যমনস্কের মত সারাদিন অফিসে কাটিয়ে আজ একটু তাড়াতাড়িই বাড়ি ফিরে এলাম। সবে সন্ধ্যে হয়েছে। আকাশে এক ধরনের মন্থর পাতলা অন্ধকার।

সৎ-মা বারান্দায় বসে রেশনের চাল বাচছিল। বাচ্চু আর হাবু যথারীতি বাড়ি নেই। কিন্তু কি আশ্চর্য, গণেশ আছে। এ সময়টা কোনদিনই তাকে বাড়িতে পাওয়া যায় না। আমি প্রায় অবাকই হয়ে গেলাম, 'আজ যে দেখি খুব গুড বয়, সন্ধ্যেবেলা বাড়ি বসে আছিস!'

গণেশ বলল, 'শরীরটা খুব খারাপ হয়েছে রে; জ্বর জ্বর লাগছে।'

'তাই—' আমিও হাসলাম। তারপর ঘরে ঢুকে অফিসের শাড়ি-টাড়ি বদলে কলতলার দিকে চলে গেলাম। আর তখনই বাবা তার ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে এল।

বাবা আর আমাকে দেখে সৎ-মা চাল-টাল ফেলে উঠে পড়ল। রান্নাঘরে গিয়ে 'জনতা' স্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল চড়াতে চড়াতে আমাদের

উদ্দেশ্যে বলল, 'এখন চায়ের সঙ্গে কি খাবি রে? দু খানা পাঁপড় ভেজে দেব?'

বাবা বলল, 'তার লগে ত্যাল মাইখা চাউরগা মুড়িও দিও। বড় খিদা পাইছে।'

তেলমাখা মুড়ি চা আর পাঁপড় নিয়ে নিজের ঘরে চলে এলাম। আসার সময় গণেশকেও ডেকে এনেছি।

খেতে খেতে বললাম, 'অফিস থেকে আসবার সময় তোর কথা খুব ভাবছিলাম। বাড়ি এসে দেখি তুই বসে আছিস—'

গণেশ বলল, 'হঠাৎ আমার কথা ভাবছিলি?'

'তোর সঙ্গে একটা খুব দরকারী কথা আছে।'

'কী?'

'বলছি। চা-টা খেয়ে নে না —'

'কেন, খেতে খেতে বলা যাবে না?'

'না।'

'বেশ।'

খাওয়া-টাওয়া হয়ে গেলে গণেশ বলল, 'এবার বলবি তো?'

ঘরের ভেতরে এক শ' পাওয়ারের বাল্‌ব জ্বলছে। উজ্জ্বল আলোয় ছোট ভাইয়ের মুখোমুখি বসে নিজের বিয়ের কথা বলতে গিয়ে গলার স্বর আটকে আসতে লাগল। অস্বস্তিতে একবার এদিকে তাকালাম, একবার ওদিকে। তারপর উঠে গিয়ে দক্ষিণের জানালার কাছে একটু দাঁড়িয়ে তক্ষুণি আবার ফিরে এলাম।

গণেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল, 'কি রে দিদি, অমন ছটফট করছিস কেন?'

'কই না তো-' স্বাভাবিক হবার জন্য আমি হাসতে চেষ্টা করলাম।

আমার চোখের ভেতর তাকিয়ে গণেশ বলল, 'তোর কি হয়েছে বল্ তো—'

'কী হবে?'

'কিচ্ছু না?'

'না।'

একটু চুপ করে থেকে গণেশ বলল, 'ঠিক আছে। এখন কী বলবার আছে বল্—'

বিয়ের কথা আজ আর বলতে পারব না। কিন্তু কিছু তো একটা বলতে হবে। না ভেবেই দুম করে বলে বসলাম, 'আচ্ছা আমি যদি মরে যাই তোরা কী করবি?'

গণেশের চোখের মণি স্থির হয়ে গেল, 'এই কথাটা বলবার জন্যেই এখানে ডেকে এনেছিস?'

হকচকিযে কী বলতে যাচ্ছিলাম, বাইরে থেকে একটা গোলমালের শব্দ ভেসে এল। তারপরেই বাচ্চু আর বাবার উত্তেজিত চড়া গলা শুনতে পেলাম; সেই সঙ্গে একটা অস্পষ্ট ফোঁপানির আওয়াজ।

বাবা চেঁচাচ্ছিল, 'বাইর হইয়া যা, বাইর হইয়া যা। জানোয়ার, শুয়োর '

বাচ্চুও চিৎকার করছিল, 'না, যাব না।'

গণেশ আমার দিকে তাকিয়েই ছিল। বলল, 'কী ব্যাপাব?'

বললাম, 'কি জানি—'

'চল্ তো দেখি—'

দু' জনে ছুটে বাইবে গেলাম। গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

বাবা আর বাচ্চু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। একটু দূরে ষোল সতের বছরের একটা মেয়ে দু হাতে মুখ ঢেকে সমানে ফোঁপাচ্ছে। সৎ-মা রান্নাঘরের দরজায় মাথায় হাত দিয়ে মূর্তির মতো বসে আছে।

গণেশ বলল, 'কী হয়েছে?'

বাবা চেঁচিয়ে উঠল, 'হইছে আমার কপাল। দ্যাখ গণ্শা, দ্যাখ হারামজাদা শুয়োরটা কারে বিয়া কইরা আইনা বাড়িতে তুলছে!'

আমি হতভম্ব। চোখের সামনে জলজ্যান্ত প্রমাণ রয়েছে, তবু বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। বাচ্চুর কতই বা বয়েস! আঠার-উনিশের বেশি হবে না। সে রোয়াকে বসে দিনরাত আড্ডা মারে, সিগারেট ফোঁকে, মেয়ে দেখলে অশ্লীল শিটি দেয়, মস্তানি করে, কথায়

কথায় পেটো ছোঁড়ে। একেবারে গোল্লায় গেছে। এ পাড়ায় ওর খুব বদনাম। সবাই ওকে ঘেন্না করে, আবার ভয়ও পায়। যতই বখে যাক, তাই বলে এভাবে হুট করে বিয়ে করে বসবে, কে ভাবতে পেরেছিল!

বাবা সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'শয়তানের ছাও, আমার নাক-কান কাটল! মাইনষেরে (মানুষকে) কেমুন কইরা যে মুখ দেখামু!'

বাচ্চু হঠাৎ ভেংচে উঠল, 'তুমি কেমন করে বিয়ে করেছিলে, মনে আছে! তারপরও তো মুখ দেখাচ্ছ; আমার বেলায়ও পারবে।'

চমকে একবার বাবাকে দেখে নিলাম। তারপরেই আমার দৃষ্টি সৎ-মার দিকে ফিরল। দু'জনের মুখ থেকেই খুব দ্রুত রক্ত নেমে যাচ্ছে।

বাজপড়া মানুষের মতো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল বাবা। তারপর গলার শির ছিঁড়ে চিৎকার করতে লাগল, 'যত বড় মুখ না তত বড় কথা। গণ্শা, জুতাব বাড়ি মাইরা কুত্তার জাতেরে খেদা (তাড়িয়ে দে) অখনই—আমার বাড়িতে আর জায়গা নাই। একখান পয়সা কামাইতে পারে না, তার আবার বিয়া! বিয়া তোমার ঘুচাইতে আছি—' বলে দৌড়ে গিয়ে কলতলার ওধার থেকে একটা বাঁশের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে এল।

বাচ্চুও রুখে দাঁড়িয়েছে। এদিকে সৎ-মা আচমকা ডাক ছেড়ে কান্না জুড়ে দিল; সেই মেয়েটার ফোঁপানিও বেড়ে গেছে।

গণেশ বিমূঢ়ের মতো বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। সে যে কী করবে, কী করা উচিত, ভেবে উঠতে পারছিল না।

আমি কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। আর দেরি করলে একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে যাবে। ছুটে গিয়ে বাবা আর বাচ্চুর মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাবার হাত থেকে বাঁশের টুকরোটা কেড়ে নিয়ে উঠোনের একধারে ছুঁড়ে দিলাম। বললাম, 'বাবা, তুমি ঘরে যাও তো—' বাচ্চুকে বললাম, 'কার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় জানিস না। যা এখান থেকে—'

বাচ্চু নড়ল না। বাবা বারান্দায় উঠে গিয়ে বলল, 'এই আপদ অখনই দূর কর বকুল ; মোটে লাই দিস না।'

'এখন তুমি চুপ কর।'

বাবা স্পষ্ট করে এবার আর কিছু বলল না ; গলার ভেতর গজ গজ করতে লাগল।

আমি এবার সেই মেয়েটির কাছে গেলাম। তার একটা হাত ধরে বললাম, 'ঘরে চল—'

মেয়েটা আমার গায়ের সঙ্গে লেপ্টে ঝুলতে ঝুলতে বারান্দায় উঠল।

বাবা ওধার থেকে বলল, 'খুব তো সুহাগ কইরা ঘরে তুলতে আছস ; এই রাবণের গুষ্টিরে খাওয়াইব কে?'

বাচ্চু সঙ্গে সঙ্গে ফোড়ন কাটল, 'তোমাকে খাওয়াতে হবে না। দেড় শ' টাকা মাইনে পাও, খাইয়ে একেবারে উল্টে দেবে। যা বুঝবার দিদি বুঝবে। তুমি মাথা ঘামিও না।' বলেই সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

বাবা অপরিষ্কার গলায় গোঙানির মতো একটা শব্দ করল। তারপর অকথ্য একটা খিস্তি দিয়ে বলল, 'শালা শুয়োরের জাত।'

আর মেয়েটাকে নিয়ে যেতে যেতে আমি থমকে গেলাম ; বুকের ভেতর শ্বাস আটকে এল যেন। এ কী বলল বাচ্চু!

কয়েক পলক দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে চলে এলাম।

এক শ' পাওয়ারের বাল্বটা জ্বলছিলই। উজ্জ্বল আলোয় মেয়েটাকে এতক্ষণে ভালোভাবে দেখতে পেলাম। খুব সাধারণ চেহারা। গায়ের রঙ শ্যামলা, লম্বাটে মুখ, পুরু ঠোঁট, ছোট্ট টোল-পড়া চিবুক, নাকটা একটু মোটা ধরনের। চোখদুটো কিন্তু ভারি সুন্দর। শান্ত, কোমল আর ভাসা-ভাসা। অনেকটা পাখির চোখের মতো। মোটামুটি চেহারার এই মেয়েটা কিন্তু ভীষণ রোগা ; তাকে ঘিরে পেট ভরে খেতে না পাওয়ার ছাপ স্পষ্ট।

এই মুহূর্তে তার পরনে আধ-ময়লা একটা শাড়ি, কপাল-সিঁথি সিঁদুরে জেবড়ে আছে ; চোখ জলে ভাসছে। গালেও চোখের জলের ভেজা দাগ।

তক্তাপোশে নিজের পাশে তাকে বসিয়ে বললাম, 'তোমার নাম কী ?'

'ভারতী।' জড়ানো গলায় ভয়ে ভয়ে মেয়েটা নাম বলল।

'তোমরা থাকো কোথায় ?'

'নবজীবন কলোনিতে।'

নবজীবন কলোনি এখান থেকে মাইল দেড় দুই দূরে ; বাসে করে নরেন্দ্রপুরের দিকে যেতে রাস্তার ডান ধারে টিনের সাইনবোর্ড চোখে পড়ে। পাশ দিয়ে অনেকবার গেছি, তবে নামা হয় নি।

যাই হোক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে যা জানা গেল, সংক্ষেপে এই রকম। ভারতীর বাবা-মা নেই ; তেমন আপনজন বলতেও কেউ না। ছেলেবেলা থেকেই নবজীবন কলোনিতে এক দূর সম্পর্কের মামা-মামীর কাছে আছে। মামার অভাবের সংসার, একগাদা কাচ্চা-বাচ্চা। কাজেই যা হয়ে থাকে, মামী কথায় কথায় তাকে বাড়ির বার করে ছ্যায়। কিন্তু কোথায় যাবে সে ? লেখাপড়াও জানে না যে ছোটখাটো একটা চাকরি-বাকরি যোগাড় করে নিজের পেটটা চালিয়ে নেবে।

দুঃখ-কষ্ট আর চোখের জলের মধ্যে দিন কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ বাচ্চুর সঙ্গে ভারতীর আলাপ হয়ে গেল।

বাচ্চুটা 'নবজীবনে' ওর এক বন্ধুর বাড়ি আড্ডা দিতে যেত। এই যাওয়া-আসার সময় আলাপটা হয়ে গিয়েছিল আর কি। আলাপের পর যা হয়, ভালোবাসাবাসি। তারপর আজ যখন মামাবাড়ির অত্যাচারটা চরমে উঠেছিল, আর সহ্য করতে না পেরে বাচ্চুকে খবর পাঠিয়েছিল। বাচ্চু ঝোঁকের মাথায় চার পয়সার সিঁদুর কিনে ভারতীর কপালে লাগিয়ে সোজা বাড়ী এনে তুলেছে।

শুনতে শুনতে আমার জীবনের ক'বছর আগেকার ছবিটাই যেন দেখতে পাচ্ছিলাম। এই কালো রোগা মেয়েটার দুঃখে কখন যে সমব্যথী হয়ে গেছি, জানি না। বিদ্যুৎ-চমকের মতো আরেকটা কথাও মনে পড়ে গেল। বাচ্চুটার বুকের পাটা আছে। চাকরি-বাকরি করে

না, এক পয়সা রোজগার নেই, অথচ কত সহজে ভারতীকে বাড়ি এনে তুলেছে। আর আমার বেলায়? চোরের মতো সিঁদুর-টিদুর মুছে ফিরে এসেছিলাম। বিজন এমনই বীরপুরুষ যে নিজের বিয়ে-করা বউকে তার বাড়ি নিয়ে তুলবার সাহসটুকু পর্যন্ত নেই! হঠাৎ বিজনের ওপর ভীষণ রাগ হতে লাগল। সেই সঙ্গে ক্ষোভ এবং অভিমান। সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক অন্যমনস্কতা কিছুক্ষণ আমাকে ঘিরে থাকল।

ওদিকে নিজের কথা বলে মুখ নিচু করে চুপচাপ বসে ছিল ভারতী। আচমকা ঝুঁকে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, আমার খুব ভয় করছে।'

তাড়াতাড়ি পায়ের কাছ থেকে তাকে তুলে বললাম, 'কিসের ভয়?'

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ভারতী বলল, 'আপনারা আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না। এখানে থাকতে না দিলে আমায় গলায় দড়ি দিতে হবে।' বলেই কাঁদতে শুরু কবল।

ভারতীর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে নরম গলায় বললাম, 'কী বোকা মেয়ে; শুধু শুধু তোমাকে তাড়াতে যাব কেন? তুমি এখানেই থাকবে। কেঁদো না— চোখ মুছে ফেল—' বলেই টের পেলাম, নিজের গলায় একটা ফাস আটকে ফেলেছি।

বাবা তো ভাগিয়েই দিতে চেয়েছিল। কেন যে মহানুভবতার অবতার হয়ে ভারতীকে ঘরে এনে ঢোকালাম! কোথায় এ বাড়ি থেকে চলে যাবার রাস্তা পরিষ্কার করব তা নয়, নিজেই নিজের পথে দেয়াল গাঁথছি। হা রে বকুল, এত বয়েস হল তোর; নিজের ভালমন্দ এখনও বুঝতে শিখলি না। কবে আর তোর বুদ্ধি হবে!

পরের দিন সবে টিফিন হয়েছে; কনক আর আমিই শুধু আমাদের সেকসনে আছি; বাকি সবাই ক্যানটিনে চলে গেছে, কাগজপত্র ফাইল-টাইল গুছিয়ে দু'জনে উঠব উঠব করছি, এমন সময় বিজন এসে হাজির।

বিয়ের দিন রাত্তিরে ট্যাক্সি করে বিজন আমাকে রাসবিহারীর মোড়ে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। বিয়ের পর আজই তাকে প্রথম দেখলাম।

বারো বছর ধরে বিজনকে কতবার দেখেছি। কিন্তু আজকের এই দেখাটা একেবারে নতুন। বিজন আমার স্বামী; তার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলাম না। তিরিশ বছর বয়েসেও অদ্ভুত এক লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিতে হল। অনুভব করছি বুকের ভেতর সিরসিরিয়ে কি বয়ে যাচ্ছে।

কনক বিজনের দিকে তাকিয়ে চোখ ভরে হাসল। বিজন আর আমাকে কত কাল ধরে দেখে আসছে সে। আমরা দু'জনে পরস্পরের কতটা কাছাকাছি এসেছি, কনক জানে। শুধু বিয়ের কথাটাই তাকে বলা হয় নি।

কনক বলল, 'আপনি না বম্বে গিয়েছিলেন—'

'হ্যাঁ—' বিজনও হাসল।

'কবে ফিরেছেন?'

'কাল রাত্তিরের ফ্লাইটে।'

বকুল বলছিল, 'আপনি সাত দিন বম্বে থাকবেন বলেছিলেন। সাতদিন তো হয় নি।'

'না, আজ ফিফ্‌থ্‌ ডে। কাজ হয়ে গেল; আর থেকে কী করব?'

'তা তো ঠিকই।'

কথা বলতে বলতে ফাইল-টাইল গোছাচ্ছিল কনক। আমিও গুছিয়ে ফেলছিলাম। উঠে দাঁড়িয়ে কনক বলল, 'এখানে বসে থেকে কী হবে। চলুন, একটা রেস্টুরেণ্ট-টেস্টুরেণ্টে গিয়ে বসা যাক। চা খেতে খেতে গল্প করা যাবে।'

'সেই ভাল।' বিজনও উঠে পড়ল। ওদের দেখাদেখি আমিও উঠলাম।

অফিস থেকে বেরিয়ে দু পা গেলেই একটা সাউথ ইণ্ডিয়ান রেস্টুরেণ্ট। আজকাল এই অফিস পাড়া মাদ্রাজী রেস্টুরেণ্টে ছেয়ে গেছে।

এ সময়টায় দারুণ ভিড়। কোথাও একটা সীট ফাঁকা নেই। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর জায়গা খালি হলে তিনজন এককোণে গিয়ে বসলাম। তক্ষুণি একটা 'বয়' ছুটে এল।

বিজন আমাদের দিকে তাকাল, 'কী খাবে?'

আবছা গলায় বললাম, 'যা হোক কিছু'—খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে চিরদিনই আমার লজ্জা।

কনকের অত সঙ্কোচ-টঙ্কোচ নেই। সে বলল, 'পকোড়া আর সাদা দোসা খাব। তারপর কফি।'

অর্ডার নিয়ে 'বয়টা' চলে গেল।

বিজন পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরিয়ে নিল। কনক বলল, 'তারপর মশাই, বম্বে কি রকম এনজয় করলেন, বলুন—'

বিজন বলল, 'এনজয় করবার সময় কোথায়? আমাদের নিউজ পেপারের লোকদের মরবার সময় থাকে না ম্যাডাম। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত খবরের খোঁজে ছোটাছুটি করেছি। রাত্রিবেলা হোটেলে ফিরে মড়ার মতো ঘুমিয়েছি। আবার ভোর বেলা উঠেই কোনরকমে 'শেভ' করে স্নান সেরে দে ছুট। ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়া দেখেছেন, চোখের দু'ধারে যাদের ঠুলি আটকানো থাকে? সামনের রাস্তা ছাড়া ওরা আর কিছুই দেখতে পায় না?'

'দেখব না কেন?'

'আমাদের অবস্থা হয়েছে তাই। নিউজ এডিটর আমাদের চোখে ঐ রকম ঠুলি আটকে দিয়েছে, খবর ছাড়া দু পাশে আর কিছুই দেখতে পাই না।'

কনক হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই হঠাৎ রগড়ের গলায় বলল, 'ঠুলিটা খুলে এবার আমার এই বন্ধুটার দিকে একটু তাকান।' বলেই আঙুল দিয়ে আমার গালে আস্তে করে টোকা দিল।

বিজন প্রথমটা হকচকিয়ে গেল। তারপর হাসল, 'ওর দিকে বারো বছর ধরেই তাকিয়ে তো আছি।'

টের পেলাম আমার কানের লতি লাল হয়ে উঠেছে। চোখ নামিয়ে নখ দিয়ে টেবলের ওপর আঁকিবুকি কাটতে লাগলাম।

কনক বলল, 'ওভাবে তাকাবার কথা বলছি না।'

'তবে?'

টেবলের ওপর দুই কনুই তুলে দুই হাতের মাঝখানে মুখটা রাখল কনক। তারপর বলল, 'বারো বছর ধরে তো অনেক খেলা দেখালেন; এবার বিয়েটা সেরে ফেলুন। এভাবে আর চলে না মশাই।'

আমাদের বিয়ে যে হয়ে গেছে সে খবরটা কনককে জানাই নি। যাই হোক, চমকে আমি মুখ তুললাম; আর তখনই বিজনের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। আমি ভুরু তুলে ইঙ্গিত করলাম; বিজন বুঝল। কনকের দিকে ফিরে হাল্কা গলায় এবার সে বলল, 'এই ব্যাপার?' বিজনের ঠোঁট ঈষৎ টেপা; তার চোখে-মুখে চিবুকের খাঁজে আলতো আভার মতো দুষ্টুমি খেলা করছে।

কনক বলল, 'হ্যাঁ, এই ব্যাপার।'

'সে দেখা যাবে।'

'দেখা যাবে বললে চলবে না। কবে বিয়েটা করছেন তাই বলুন। দিন-ক্ষণ-তারিখ দিন—'

'আপনারই দেখছি যত তাড়া। আপনার বন্ধুর কিন্তু এ ব্যাপারে একেবারে গরজ নেই।'

'গরজ নেই, আপনাকে বলেছে!'

'মুখ ফুটে কিছু বলে নি। হাবেভাবে তাই মনে হয়।' বলে চোখের কোণের দিকে মণিদুটো এনে আমাকে বিদ্ধ করতে লাগল বিজন। আমি মুখ ফিরিয়ে ঠোঁট টিপে হাসতে লাগলাম।

'বয়' খাবার নিয়ে এসেছিল। খেতে খেতে কনক বলতে লাগল, 'বকুলের গরজ আছে কি নেই, আমি বুঝব। আপনি এ মাসের মধ্যেই বিয়েটা চুকিয়ে ফেলুন। নইলে—'

'কী ?'

'আপনাদের বিয়ে আমার আর দেখা হবে না।' বুকে একটা আঙুল ঠেকিয়ে কনক বলতে লাগল, 'এই ইতরজন মিষ্টান্ন থেকে বঞ্চিত হবে।'

বিজন অবাক, 'তার মানে !'

'এই মাসটাই আমি কলকাতায় আছি। তারপর—'

'তারপর কী ?'

চোখ বুজে খুব মজা করে কনক বলল, 'আমার দুটো ডানা গজাবে।'

বিজন বিমূঢ়ের মতো প্রতিধ্বনি করল, 'ডানা গজাবে !'

'ইয়েস স্যার।'

বিজন এবার আর কিছু বলল না। কনকের হেঁয়ালি বুঝতে না পেরে একবার তার দিকে আরেক বার আমার দিকে তাকাতে লাগল।

আমার খুব হাসি পাচ্ছিল। আস্তে করে বললাম, 'কনকের বিয়ে হচ্ছে।'

প্রথমটা হকচকিয়ে গেল বিজন। তারপর প্রায় লাফিয়েই উঠল, 'তাই নাকি। কবে ? কার সঙ্গে ?'

কার সঙ্গে কবে বিয়ে হচ্ছে, আমিই বললাম। কনক বিয়ের কথায় কিশোরী মেয়ের মতো মুখ লাল করে হাসতে লাগল।

আন্তরিক স্বরে বিজন কনককে বলল, 'খুব খুশি হলাম ম্যাডাম। কিন্তু—'

কনক ভুরু তুলে বলল, 'কী ?'

'কাণ্ডটি ঘটালেন কি করে ?'

'ঘটে গেল ! আপনাদের মতো দশ-শালা পরিকল্পনা আমাদের

নেই। যা করবার আমরা চটপট সেরে ফেলি।'

'দারুণ করিৎকর্মা!' বলতে বলতে হঠাৎ কি মনে পড়ে গেল বিজনের। ফস করে সে বলে বসল, 'আগেও আরেকবার আপনার বিয়ে হয়েছিল না?'

কনকের মুখে কালচে ছায়া পড়তে পড়তেই মিলিয়ে গেল। হেসে হেসে সে বলল, 'শুনেছি লণ্ডনের খবর কাগজে অদ্ভুত অদ্ভুত বিয়ের খবর বেরোয়। হী ফর সিক্সথ টাইম, শী ফর থার্ড টাইম। তার মানে বরের এটি ষষ্ঠ বিবাহ; আগের পাঁচটা তালাক হয়ে গেছে। আর কনের এটা তৃতীয় বিবাহ; আগের দু'বার তালাক হয়েছে। আমার বেলায় এটা সেকেণ্ড হতে পারে কিন্তু আমার বর এই প্রথম বিয়ে করছে। এই শুভকামনাটুকু করুন. আমি যেন ওকে সুখী করতে পারি।'

বিজন থতমত খেয়ে গেল। তারপর গভীর গলায় বলল, 'নিশ্চয়ই সুখী হবেন। আমার কথায় কিছু মনে করবেন না। মুখ ফসকে কি করে যে কথাটা বেরিয়ে গেল। আমি কিন্তু আপনাকে দুঃখ দেবার জন্য বলি নি।'

আলতো করে বিজনের একটা হাত ছুঁয়ে কনক বলল, 'আরে না না; কিছুই মনে করি নি।'

একটু চুপ করে থেকে বিজন বলল, 'বিয়ের পরই তা হলে উড়ছেন?'

'অরুণের সেরকমই তো ইচ্ছে।'

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর কনকই আবার বলল, 'চেষ্টা করুন যাতে আমাদের সঙ্গে আপনাদের বিয়েটাও হয়ে যায়। দারুণ হুল্লোড় করা যাবে তা হলে।'

'দেখি।' দ্রুত আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল বিজন।

পকোড়া-টকোড়া খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। কফিও এসে গেছে। এক চুমুকে কফি শেষ করে আচমকা উঠে পড়ল কনক।

আমি বললাম, 'এ কি, উঠছিস যে!'

কনক বলল, 'হ্যাঁ, যাই। তোরা গল্পটল্প কর।' অর্থাৎ বিজনকে

আর আমাকে কিছুক্ষণ একসঙ্গে থাকতে দিতে চায় সে।

বিজন বলল, 'আপনি বসুন তো।'

কনক বসল না। বলল, 'আরে বাবা, পাঁচ দিন পর দেখা হচ্ছে; এখন কি থার্ড পার্সনের থাকতে আছে। আমরা বিহারের বাঙালী; ছেলেবেলাটা ওখানেই কেটেছে। বিহারে একটা কথা আছে—কাবাবমে হাড্ডি। কাবাবের ভেতর হাড় হয়ে আমি এখানে বসে থাকতে চাই না।' কনক হাসতে হাসতে চলে গেল। তাকে কিছুতেই আটকে রাখা গেল না।

কনক যাবার পর চুপচাপ একটা সিগারেট খেল বিজন। তারপর বলল, 'কেমন কাজের মেয়ে দেখ। এক মাসের মধ্যে প্রেম বিয়ে টিয়ে সেরে চলে যাচ্ছে। আর তুমি?'

'আমি কী?'

'এক নম্বরের হাঁদারাম।'

টুকরো টুকরো এলোমেলো কথার ফাঁকে হঠাৎ একসময় দুম করে সে বলল, 'আমাদেব বিয়ের কথাটা বাড়িতে জানিয়েছ?'

'না—' আমি মাথা নাড়লাম।

'কেন?'

'কি করে জানাব, বাড়িতে যা কাণ্ড হল!'

বিরক্ত মুখে বিজন জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

ভারতী আর বাচ্চুর ব্যাপারটা আগাগোড়া বলে গেলাম।

সব শুনে বিজন প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'বাঃ বাঃ চমৎকার! এবার প্রেমসে ধর্মশালা চালাও।'

ওর বলার ধরনে হেসে ফেললাম।

বিজন ধমকের গলায় বলল, 'হেসো না তো।'

'তবে কি কাঁদব?'

'ইয়ার্কি করতে হবে না। যা বলছি শোন—'

'বল।'

বিজন বলতে লাগল, 'বাড়িতে জানানো না-জানানো তোমার ইচ্ছে।

ছ' মাস সময় দিয়েছি। তারপর কিন্তু আর একটা দিনও পাবে না, কোন রকম টালবাহানাও শুনব না। তুমি যা মেয়ে; জোর করেই তোমাকে আমার কাছে নিয়ে আসতে হবে।'

তক্ষুণি উত্তর দিলাম না। মনে মনে ভাবলাম, কেন যে বিজন জোর করে না। অনেকক্ষণ পর বললাম, 'কিন্তু—'

'কী?'

'অত তাড়াহুড়ো করছ কেন?'

ভুরু কুঁচকে গেল বিজনের, 'বিয়ে করতে লাগল দশ বছর। তোমার কি ইচ্ছে আরো দশ বছর ঝুলে থাকবার পর সংসার করি?'

আস্তে করে বললাম, 'না, তা নয়।'

'তবে?'

'আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম; তোমারও তো অনেক দায়-দায়িত্ব আছে। সে সবের ব্যবস্থা না করে—'

বিজন ক্ষেপে উঠল, 'তোমার কি ইচ্ছে, হোল লাইফ পরের বার্ডেন বয়ে বয়ে কাটিয়ে দিই?'

আমাদের পারিবারিক দায়িত্বের ব্যাপার নিয়ে এ জাতীয় কথা আগেও অনেকবার হয়েছে। বিজনের সঙ্গে দেখা হলেই এ প্রসঙ্গ একবার না একবার আসবেই। থতমত খেয়ে গেলাম, 'না-না, তা কেন? কিন্তু—'

বিজন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না; মুখ ফিরিয়ে সামনের রাস্তার দিকে তাকাল। দুপুর আর বিকেলের মাঝামাঝি এই সময়টায় এখানে এই অফিস-পাড়ার রাস্তায় ভীষণ ভিড়। চারদিকের বড় বড় অফিসগুলো থেকে হুড় হুড় করে কেরানী-টাইপিস্ট-স্টেনোগ্রাফারের ঝাঁক বেরিয়ে এসেছে। তা ছাড়া স্রোতের মতো গাড়ি ছুটছে। ওদিকের ফ্রী-পার্কিং জোনে একগাদা প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে আছে।

অন্যমনস্কর মতো কিছুক্ষণ গাড়ি দেখল বিজন. কেরানী দেখল, এ্যাসফাল্টমোড়া ঝকঝকে রাস্তার জেব্রা-লাইন দেখল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে খুব শান্ত ধীর গলায় বলল, 'বাড়ীর সবার ব্যবস্থার কথা ভেবেছি।'

'কী ?'

'মাকে একটা মেণ্টাল হসপিটালে পাঠিয়ে দেব। সব চাইতে বড় প্রবলেম যেটা তা হল দিদি আর তার ছেলেমেয়েরা। দিদির বড় ছেলেটা এবার বি. কম. পার্ট টু দিয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ; পাশ নিশ্চয়ই করে যাবে। ওর চাকরির জন্যে কয়েকজনকে ধরেছি। এই ছেলেটার চাকরি হয়ে গেলে দিদিকে আলাদা বাড়ি ভাড়া করে দেব। তারপর বাকি রইল ছোট বোনটা। আপাতত ও আমাদের কাছেই থাকবে। পরে সুবিধে টুবিধে হলে ওর বিয়ে দিয়ে দেব।'

এই পরিকল্পনার কথা আগেও টুকরো টুকরো ভাবে শুনিয়েছে বিজন। ওর ভাগনের চাকরির কথায় গণেশের মুখটা চট করে মনে পড়ে গেল। বললাম, 'তোমার তো অনেক জানাশোনা ; আমার ভাইয়ের একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দাও না। ওর কিছু হলে আমার পক্ষে চলে আসা সহজ হবে।'

'কিন্তু—'

'কী ?'

'আমার ভাগনের জন্যে বলে রেখেছি। আগে ওরটা হোক, তারপর না হয় তোমার ভাইয়ের কথা বলব। দু'জনেরটা একসঙ্গে করতে গেলে গোলমাল হয়ে যাবে।'

'তা হলে পরেই চেষ্টা কোরো।'

'আচ্ছা।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর কি মনে পড়তে বিজন হঠাৎ বলে উঠল, 'আসছে রোববার তোমার কোন জরুরী কাজ আছে ?'

'না, তেমন কিছু নেই। কেন ?'

'সুধীর আজ অফিসে ফোন করেছিল। তার খুব ইচ্ছে সেদিন তুমি আমি ওদের বাড়ি যাই। সারাদিন থেকে হৈ-হুল্লোড় করি।'

আমার খুব একটা আপত্তি ছিল না। ছুটির দিনে খুব জরুরী ব্যাপার না থাকলে আমি বাড়ি থেকে বেরুই না। কিন্তু বাড়ি থাকা মানেই ঝগড়াঝাটি, চেঁচামেচি, তিক্ততা। আমার সঙ্গে কারো অবশ্য

ঝগড়া হয় না। সৎ-মার সঙ্গে বাবার, বাবার সঙ্গে বাচ্চু কি হাবুর কিংবা বাচ্চুর সঙ্গে সৎ-মার যুদ্ধ লেগেই থাকে। বিশেষ করে ভারতী আসার পর আমাদের বাড়ির ছাদে কাক-চিল বসতে পারে না। তাতে আমার মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। তার চাইতে বিজনের বন্ধুর বাড়ি গিয়ে হৈ-চৈ করে দিনটা কাটিয়ে আসা মন্দ কি।

বললাম, 'ঠিক আছে, যাব।'

'তা হলে তুমি এক কাজ কোরো—'

'বল—'

'রোববার সকাল সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার ভেতর হাওড়া স্টেশনে এনকোয়ারি অফিসের সামনে ওয়েট কোরো। ওখান থেকে তোমাকে নিয়ে যাব।'

'সুধীর সেনরা থাকে কোথায়?'

'শ্রীরামপুর।'

দিন কেটে যাচ্ছে।

রোজই টিফিনের সময় বিজন আসে ; বারো বছর ধরেই আসছে অবশ্য যেদিন খবরের সন্ধানে তাকে কলকাতার বাইরে যেতে হয় সেদিনটা বাদ।

ওর ভাগনের চাকরিটা এখনও হয় নি। সেজন্য খুবই দুশ্চিন্তায় আছে বিজন। তবে তার আশা, শিগ্‌গিরই হয়ে যাবে।

বিজন রোজই বারকয়েক করে সেই কথাটা মনে করিয়ে দেয়—আমি যেন বিয়ের কথাটা বাড়িতে বলে রাখি। ভাগনের চাকরিটা একবার হয়ে গেলে সে একটা দিনও আর দেরি করবে না ; আমাকে তার কাছে নিয়ে যাবে। এই চরমপত্র শুনতে শুনতে আমার কান পচে গেছে।

বিজন যতই তাড়া লাগাক, রাগ করুক কিংবা বিরক্ত হোক, বিয়ের কথাটা এখনও আমি বাড়িতে জানাতে পারি নি। আপনাদের আগেই বলেছি, বাচ্চু যেদিন দুম করে ভারতীকে এনে তুলল সেদিন থেকে আমাদের বাড়ির পরিবেশ দারুণ খারাপ হয়ে গেছে।

সৎ-মা মুখে বিশেষ কিছু বলে না। সারাদিন শুধু বিষাক্ত কুটিল চোখে ভারতীর দিকে তাকিয়ে থাকে। অভাবের সংসারে নতুন এক ভাগীদারকে দেখে সে খুশি হতে পারে নি।

হাবু বা গণেশের মনোভাব ঠিক বোঝা যায় না। ওরা কতক্ষণই বা বাড়ি থাকে! তবে ওরা যে সন্তুষ্ট হয় নি, এটা তাদের মুখচোখ দেখলেই টের পাওয়া যায়।

ভারতী এ বাড়িতে আসার পর ড্রেনের ধারের ঘরটা গণেশ তাকে আর বাচ্চুকে ছেড়ে দিয়েছে। আজকাল রাত্রিবেলা আমার ঘরের মেঝেতেই বিছানা পেতে ঘুমোয় গণেশ। একেক দিন শুয়ে শুয়ে গণেশ বলে, 'বাচ্চু উল্লুকটা এ কী করল!'

আমি হেসে হেসে বলি, 'ভালোই তো করেছে।'

গণেশ উত্তেজিত হয়ে ওঠে, 'ভালো করেছে মানে!'

তার উত্তেজনাকে উস্কে দেবার জন্য রগড়ের গলায় বলি, 'ভালো না তো খারাপ নাকি? তোরা বড় হয়ে বিয়ে সাদি করছিস না; ও আর কদ্দিন বসে থাকবে! বাড়িতে একটা বউ এল; এ বেশ ভালোই হয়েছে।'

অন্ধকারে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গণেশ বলে, 'তুই কী দিদি!'

'আমি কী?'

'তুই একটা বোকা। ফ্যামিলির এই হাল; তার মধ্যে মাকড়াটা একটা ঝঞ্ঝাট জুটিয়ে আনলে। নিজেদেরই খেতে জোটে না—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায় গণেশ।

আমি বলি, 'সব ঠিক হয়ে যাবে। ঘাড়ে চাপ পড়েছে; বাচ্চুটা এবার নিজের গরজেই রোজগার-টোজগারের দিকে মন দেবে।'

'কচু দেবে। ও খচড়াকে আমি চিনি না!'

একটু চুপচাপ।

তারপর গণেশই আবার শুরু করে, 'আমার কী! তেমন বুঝলে আমি শালা স্রেফ নাগা সন্ন্যাসী হয়ে কেটে পড়ব।'

ওর বলার ধরনে হেসে ফেলি। গণেশ তাতে রেগে যায়। ধমকের গলায় বলে, 'হাসিস না তো দিদি।'

আমার হাসি তাতে থামে না। এ বাড়িতে এই একটামাত্র ছেলে যার কাছে এসে কিছুক্ষণের জন্য আমি সব ভুলে যাই। খানিকটা টাটকা সজীব নির্মল বাতাসের মতো সে আমার তিরিশ বছরের ক্লান্ত জীর্ণ ফুসফুসকে অনেকখানি শক্তি দেয়।

হাল ছেড়ে দেবার মতো করে গণেশ বলে, 'হেসে যা, হেসে যা. প্রাণ খুলে হেসে যা। আমার কী, ফাঁসবি তো তুই।'

আমার হাসি থেমে যায়, 'ফেঁসে যাব! তার মানে?'

'মানে আর কী। তোকেই তো ওদের পুষতে হবে। এ শালার ঝঞ্ঝাট তুই ছাড়া আর কে নেবে। আমি বেট ফেলে বলতে পারি কোন মাকড়াই নেবে না।'

আমি আর কিছু বলি না। হাসিও না।

গণেশ আবার বলে, 'তুই চিরকাল একই রকম থেকে গেলি দিদি।'

অন্যমনস্কের মতো বলি, 'কি রকম?'

'একেবারে বোকা, বোকা, বোকা।' গাঢ় সহানুভূতির গলায় গণেশ বলে যায়, 'লোকে গা থেকে ঝামেলা ঝেড়ে ফেলে গ্যায়। আর তুই কিনা ফালতু ঝঞ্ঝাটে নিজেকে জড়াস।'

আমি উত্তর দিই না।

গণেশ আবার বলে, 'বাবা সেদিন ছুটোকে ভাগিয়ে দিচ্ছিল, ভালোই হচ্ছিল। তুই মাইরি দিদি দয়ার সাগরে ঢেউ খেলিয়ে মেয়েটাকে ঘরে এনে তুললি। এর কোন মানে হয়?'

বিজনও এই কথাগুলো আরেক রকমভাবে সেদিন আমাকে বলেছিল।

বাচ্চু আর ভারতীর সম্বন্ধে বাবার মনোভাব খুব পরিষ্কার। সকা

বেলা বারান্দায় বসে নিমের দাঁতন করতে করতে সূর্যস্তব আওড়ানোর মতো বাবা বলে যায়, 'পিতলা শখ! বিয়া করছে! এক কড়ার মুরদ নাই; হারামজাদার বিয়া! জুতার বাড়ি মাইরা বাড়িব থনে খেদাইয়া দিমু।'

আগে আগে বাচ্চুকে তবু বাড়িতে দেখা যেত। আজকাল আর দেখতেই পাই না। ভারতীকে এনে তোলার পর সে কখন বাড়ি আসে কখন যায়, কে জানে। হুম করে ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ করে হয়তো তার মধ্যে এক ধরনের অপরাধবোধ জেগেছে। অভাবের সংসারে আরেকটা মানুষের বোঝা চাপানো যে ঠিক হয় নি, এটা সে টের পেয়েছে।

তবু কখনও সখনও বাড়ি থাকলে বাবার বিরুদ্ধে বাচ্চু রুখে দাঁড়ায়। ঘাড় বাঁকিয়ে সে বলে, 'চুপ কর।'

বাবা গলার শির ছিঁড়ে চেঁচাতে থাকে, 'চুপ করুম! ক্যান তর ডরে!'

'চুপ কর বলছি।'

'হারামজাদা শুয়োরের ছাও, আমারে চোখ গরম দেখাও। জুতাইয়া তর গাল ছিড়া ফালামু।'

কিছুক্ষণ পলকহীন তাকিয়ে থাকে বাচ্চু। তারপর গলার ভেতর চাপা শিসের মতো শব্দ করে বলে, 'শুধু শুধু চেল্লাচ্ছ কেন?'

বাবা ক্ষেপে যায়, 'শুধাশুধি! বজ্জাত শয়তান—কুকর্ম করবা, আর আমি চিল্লামু না? চিল্লাইলেই দোষ?'

'তুমি কেন চেল্লাবে? তুমি কি আমাদের খাওয়াচ্ছ? পরাচ্ছ? যদি কিছু বলতে হয় দিদি বলবে।'

এবার বোধহয় বাবার শরীরের সব রক্ত গিয়ে মাথায় চড়ে বসে, 'আমি না হয় খাওয়াই না, আমি না হয় পরাই না। কিন্তু আমার বাড়িতে তো থাকস। বাইর হইয়া যা, অক্ষণই বাইর হ। আমার বাড়িতে তর জায়গা নাই—'

বাচ্চু বলে, 'যাব না; দেখি তুমি কী করতে পার।' গলার রগ

টান করে বাবার সঙ্গে সমানে যুদ্ধ চালিয়ে যায় বাচ্চু।

যখন ব্যাপারটা বাড়াবাড়িতে গিয়ে ঠেকে তখন আমি আর মুখ বুজে থাকতে পারি না। বকাবকি করে ধমকে বাচ্চুকে বাড়ির বাইরে পাঠিয়ে দিই। আর যার সঙ্গেই যা করুক, আমার মুখের ওপর কোন কথা বলে না বাচ্চু। যত দুর্বিনীত অসভ্য আর গোঁয়ার হোক না, আমি কিছু বললে চোখ নামিয়ে তা শোনে।

বাচ্চু আর কতক্ষণ বাড়ি থাকে! তার চায়ের দোকানের আড্ডা আছে, বন্ধুবান্ধব আছে, হাজার রকমের হুল্লোড়বাজি আছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ষোল ঘণ্টাই তার বাইরে বাইরে কেটে যায়। কিন্তু ভারতী? 'বাইরে' বলতে তার কিছু নেই। সাড়ে চার কাঠা জায়গার পুরনো কিম্ভুত চেহারার সাড়ে তিনখানা ঘরের মধ্যেই তার সমস্ত দিন কাটে।

মেয়েটার মুখের দিকে তাকানো যায় না। সারা গায়ে দুর্বহ গ্লানি আর অপমান মেখে সবসময় মেয়েটা যেন মরমে মরে আছে। মামার সংসার থেকে বাঁচবার জন্য আমাদের বাড়ি এসেছিল ভারতী, কিন্তু এ বাড়িটাও যে তার মামাবাড়ির মতোই একটা মরণকূপ কিংবা অগ্নিকুণ্ড, এটাই সে জানত না। সার্কাসে কারা যেন মৃত্যুকূপে বা আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পরক্ষণেই হাসতে হাসতে অক্ষত বেরিয়ে আসে। তেমন কোন ম্যাজিকের খেলা মেয়েটা জানে না। তাই সমস্ত দিনই ভারতীর মুখ করুণ, বিষণ্ণ, ভারাক্রান্ত।

বাচ্চুকে তো আর সবসময় হাতের কাছে পাওয়া যায় না। বাবা তাই ভারতীর পেছনে লেগে আছে। ফ্যাক্টরির সময় ছাড়া সারাদিনই বাবা বাড়িতে থাকে আর বকে যায়।

বাবা বলে, 'তোমার কি এট্টু লাজ-সরমও নাই! বাউচ্চার (বাচ্চুর) কান্ধে উইঠা ড্যাং ড্যাং করতে করতে এই বাড়িতে আইসা উঠলা!'

ভারতী উত্তর ছায় না। একেবারে এতটুকু হয়ে মাটির সঙ্গে যেন মিশে যেতে চায়।

বাবা বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে এবার বলে, 'ছিঃ—ছিঃ—আমরা হইলে গলায় দড়ি দিতাম।' এই সময় হয়তো বাবা তার 'দু নম্বর' বিয়ের কীর্তিটার কথা একেবারে ভুলে যায়।

ভারতী চুপ।

বাবা আবার বলে, 'তুমি তো জানতা বাউচ্চার একটা বাপ আছে। হ্যায় (সে) অখনও চিতায় ওঠে নাই।'

ভরাতী এবারও চুপ।

বাবা ধমকে ওঠে, 'মুখ বুইজ্জা থাকলে চলব না। কও, জানতা কিনা?'

ভারতী মুখ তোলে না। ভয়ে ভয়ে আস্তে করে মাথা নাড়ে।

বাবা বলে, 'আমি যখন মরি নাই তখন একবার ভাবলা না পোলারে নিকা করণের আগে তার বাপের মতামতখান লওন (নেওয়া) দরকার।'

বাবা আবার বলে, 'তুমি কি জানতা বাউচ্চা শুয়োর একখান পয়সা কামায় না?'

ভারতী মাথা নাড়ে, অর্থাৎ জানত।

গলার স্বর সাত পর্দা চড়িয়ে বাবা চেঁচায়, 'কি ভাইবা তুমি একটা বেকার নিষ্কর্মা মস্তানরে বিয়া করলা, অ্যাঁ?'

ভারতী নিশ্চুপ।

বাবা চেঁচিয়েই যায়, 'অখন যদি ঘেটি ধইরা তোমাগো দুইজনরে বাড়ির বাইর কইরা দেই, কেমুন হয়? নিলজ্জ বেহায়া মাইয়া, পরের বাড়িতে এমুন কইরা আইসা থাকতে হয়।'

ভারতী এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, মনে হয়, কেউ যেন পেরেক ঠুকে পা দুটো মাটির সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে।

বাবার হঠাৎ যেন মনে পড়ে যায়, ভারতীটা একটা কথাও বলছে না। কিছুক্ষণ চোখ কুঁচকে থেকে সে বলে, 'কি, চুপ কইরা আছ যে?'

ভারতী আগের মতোই বোবা হয়ে থাকে।

কেউ যদি বিনা প্রতিবাদে সব অপমান মাথা পেতে নেয়, কতক্ষণ

আর তার সঙ্গে একতরফা বকা যায়? বাচ্চুর মতো ভারতী যদি রুখে দাঁড়াত বাবা তার বিরুদ্ধে হয়তো হাজার বছর যুদ্ধ চালিয়ে যেত। কিন্তু একলা চেঁচিয়ে একসময় সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তার আগে ভারতীর রাগ উস্কে দেবার জন্যই কিনা বলে, 'একটা কথারও তো জবাব গ্যাও না। আমারে দেখলেই তোমার বাক্য হইরা যায় দেখি।'

এর পরও ভারতী বোবাই থেকে যায়।

বাবা বলে, 'মনে করছ বোবা সাইজা পার পাইবা! তোমার শয়তানি আমি বুঝি না?'

বাবার এ জাতীয় কথাতেও ভারতীর আত্মসম্মানবোধের কোথাও ধাক্কা লেগেছে বলে বুঝবার উপায় নেই। আসলে পরের বাড়ি থেকে, নিতান্ত বেঁচে থাকার জন্য উঠতে বসতে অপমান সয়ে সয়ে আত্মসম্মান নামক বস্তুটা তার মধ্যে কোনদিনই মাথা চাড়া দিতে পারে নি।

আগাগোড়া ভারতীকে চুপচাপ থাকতে দেখে বাবার রাগটা একসময় বিপজ্জনক সীমায় পৌঁছে যায়। লাফ দিয়ে ভারতীর খুব সামনে এসে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে চিৎকার করতে থাকে, 'ছুটাইয়া দিমু পিতলা পিরীত, নিচ্চয় ছুটাইয়া দিমু। আমারে অখনও চিনো নাই।'

ভারতী তবু চুপ। মেরুপ্রদেশের বরফের নদীর মতো মেয়েটা বড় শীতল।

ভারতীর করুণ ছায়াচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বড় মায়া হয়। ওকে আমার ঘরে ডেকে এনে কাছে বসিয়ে প্রায়ই বলি, 'বাবা তোমাকে খুব বকে, না?'

ভারতী এক পলক আমার দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নেয়। সহানুভূতির একটুখানি ছোঁয়ায় ঘাড় গুঁজে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে।

তার পিঠে-মাথায়-ঘাড়ে-গলায় হাত বুলোতে বুলোতে বলি, 'কি বোকা মেয়ে রে, কাঁদে না।'

ভারতী কিছু বলে না, শুধু কাঁদতেই থাকে।

আমি বলি, 'বাবার স্বভাবটাই ওইরকম। গ্যাখ না, সবার সঙ্গেই রাতদিন খিটখিট করছে। বাবার কথায় কিছু মনে কোরো না।'

কান্না জড়ানো আবছা গলায় ভারতী বলে, 'আমার আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না দিদি।'

'দূর পাগল মেয়ে ; এসব আজেবাজে কথা কক্ষনো ভাববে না।'

ভারতী আমার কথা ভাল করে শোনে কিনা কে জানে, আপন মনেই সে বলে যায়, 'যেদিকে দুচোখ যায়, একদিন চলে যাব।'

ধমকের গলায় বলি, 'আবার ওসব ভাবছ! কোথাও তোমায় যেতে হবে না। তুমি এখানেই থাকবে। আর বাবা যদি কিছু বলেও, এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বার করে দেবে ; কিচ্ছু মনে করে রাখবে না।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর আবার শুরু করি, 'একটা কথা বলব ভারতী—'

'কী?' মুখ তুলে আমার দিকে তাকায় মেয়েটা। তার গালে, চোখের তলায় ভেজা জলের দাগ। সেই সঙ্গে কিছুটা উৎকণ্ঠাও যেন তার চাউনিতে ফুটে ওঠে।

'এভাবে তো চিরকাল চলবে না। বাচ্চুকে তুমি একটা চাকরি-বাকরি করতে বল। দেখো, ও একটা চাকরি পেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

চোখ নামিয়ে নখ খুঁটতে খুঁটতে ভারতী বলে, 'আমি তো রোজ ওকে চাকরির কথা বলি।'

'বাচ্চু কী বলে?

'কিছু বলে না। তবে—'

'কী?'

একটু চুপ করে থেকে ভারতী শুরু করে, 'বার বার চাকরির কথা বললে ও খুব রেগে যায়। বলে, এ বাড়ি ঢুকেই রং ছাড়তে আরম্ভ করেছ! চাকরি নিয়ে অত মাকড়াবাজি তোমাকে করতে হবে না। যা বুঝবার আমি বুঝব। তোমাকে এনেছি ; স্রেফ কালা বোবা হয়ে থাকবে। একদম ঠোঁট ফাঁক করবে না ; বেশি খিচিস খিচিস করলে লাইফ এ্যাসিড করে ছেড়ে দেব।'

আমি অবাক, 'বাঁদরটা এই সব বলে নাকি !'

'হ্যাঁ –' ভারতী বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ে, 'এখন আমি কি করি বলুন তো দিদি ?'

'ঠিক আছে, তোমাকে কিছু বলতে হবে না। আমিই বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেখব'খন।'

ভারতী প্রথম যেদিন বাচ্চুর সঙ্গে আমাদের বাড়ী এসেছিল সেদিন তার পরনে ছিল একটা আধপুরনো রঙজ্বলা হলুদ ছাপা শাড়ি ; সবুজ ব্লাউজ আর তালি-দেওয়া লেডিজ চটি। দু হাতে স্টেনলেস স্টীলের দুটো চুড়ি আর কানে ফিনফিনে সরু মাকড়ি ছাড়া তার গায়ে ধাতুর চিহ্ন মাত্র ছিল না। পরনের ওই শাড়ি জামা ছাড়া সঙ্গে করে সে আর কিছুই আনে নি। বাচ্চু হারামজাদাটা ওকে রাস্তা থেকেই নিয়ে এসেছিল।

হাজার হোক মেয়ে তো। এক জামাকাপড়ে চালানোর কত যে অসুবিধে। প্রথম প্রথম ভারতীকে আমার শাড়ি-টাড়ি পরতে দিতাম। তারপর মাসের শেষে মাইনে পেলে একদিন ওর জন্য দু-খানা প্রিন্টেড শাড়ি, লনের ব্লাউজ, সায়া আর চটি কিনে দিয়েছি।

নতুন জামা-কাপড় পেয়ে ভারতী কি যে খুশি! একবার সে পোশাকগুলোর ভাঁজ খুলে খুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছাখে, একবার গন্ধ শোঁকে। দেখতে দেখতে তার চোখমুখ চকচক করতে থাকে। তারপর সযত্নে পাট করে করে বাক্সে সাজিয়ে রাখে। আবার একটু পরেই ছুটে এসে বাক্স খুলে জামা-কাপড়গুলো দেখতে বসে।

ওর ছেলেমানুষি কাণ্ড দেখে আমি হেসে ফেলি। বলি, 'শাড়ি-টাড়ি তোমার পছন্দ হয়েছে তো ?'

খুশিতে ডগমগ ভারতী মাথাটা একদিকে অনেকখানি হেলিয়ে বলে, 'হুঁ—'

এই মেয়েটাই যে বাবা খিটখিট করলে কোন কোন দিন আত্মহত্যা করতে চায় কিংবা যেদিকে দু-চোখ যায় সেদিকে চলে যাবার সংকল্প করে

বসে, এখন তার এই ঝকমকে উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে সে কথা আর ভাবতে পারা যায় না।

জামা-টামা নাড়াচাড়া করতে করতে একসময় হয়তো ভারতী বলে, 'জানেন দিদি—'

তার চোখের ভেতর তাকিয়ে বলি, 'কী বলছ ?'

'আমাকে এর আগে আর কেউ এতগুলো শাড়ি-জামা-জুতো একসঙ্গে কিনে দ্যায় নি। মামার বাড়ি থাকতে মামী আর মামাতো বোনদের ছেঁড়া-ছেঁড়া পুরনো কাপড় পবতে পেতাম। শুধু পুজোর সময় একখানা নতুন শাড়ি জুটত। সেই শাড়িটা হাতে দেবার সময় মামী আমার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধাব করে ছাড়ত। চোখের জল না ফেলে কোনদিন আমি নতুন শাড়ি পরতে পারি নি দিদি।'

আপনাদের আগেই বলেছি, আমি মেয়েটা ভারি দুর্বল। বিজন যে বলে একটুতেই আমি গলে যাই, তা বোধ হয় মিথ্যে নয়। ভারতীর কথা শুনতে শুনতে আমার চোখে জল এসে যায়। বুকের কোন এক অদৃশ্য তারে বিষাদের মতো কী বাজতে থাকে! ভারী গাঢ় গলায় বলি, 'এসব কথা থাক ভারতী ; তুমি তো এখন আর মামাবাড়িতে নেই।' বলেই যেন কট করে জিভে কামড় খাই। মামাবাড়ি ছেড়ে কি সুখের রাজ্যেই না এসে পড়েছে মেয়েটা।

আমাদের বাড়ির কাছেই বড় রাস্তার ধারে একটা সিনেমা হল। তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে পারলে একেক দিন ভারতীকে নিয়ে সিনেমায় চলে যাই। আমাদের বাড়ির যা অবস্থা! সবসময় বারুদের স্তূপ হয়ে আছে ; এক টুকরো আগুনের ফুলকি এসে পড়লেই হল। এই শ্বাসরুদ্ধকর বিস্ফোরক পরিবেশের মধ্যে একটা বাচ্চা মেয়েকে দিনের পর দিন কাটাতে হলে দম বন্ধ হয়েই সে মরে যাবে। বাঁচিয়ে রাখার জন্যই মাঝে মাঝে ওর ফুসফুসে বাইরের মুক্ত বাতাস লাগিয়ে আনা দরকার।

সিনেমায় নিয়ে গেলে কি খুশি যে হয় মেয়েটা। বলে, 'জানেন দিদি, আমার সিনেমা দেখতে খুব ভাল লাগে। কিন্তু—'

'কী ?'

'আপনি আমাকে তিন চারটে বই দেখালেন। তার আগে মামাবাড়ি থাকতে সবসুদ্ধ্ ক'টা বই দেখেছি জানেন ?'

'ক'টা ?'

'মোটে একটা। তাও মামারা কেউ দেখায় নি।'

'তবে ?'

'পাশের বাড়ীর একটা বউ আমাকে খুব ভালবাসত ; সে-ই নিয়ে গিয়েছিল। তাই নিয়ে কী কাণ্ড!'

'কিসের কাণ্ড ?'

'মামীটা ভীষণ হিংসুটে আর ঝগড়াটি। পাশের বাড়ির বউটার সঙ্গে সে তিনদিন ঝগড়া করেছিল আর আমার যে কী অবস্থা করেছিল তা আমিই জানি।'

ভারতীর সঙ্গে আমার জীবনের প্রচুর মিল। নেহাত স্কুল ফাইনালটা পাশ করে টাইপ শিখে একটা চাকরি জোটাতে পেরেছিলাম, নেহাত মাসের পয়লা তারিখে এক কাঁড়ি টাকা সৎ-মা'র হাতে তুলে দিতে পারি ; তা না হলে আমার অবস্থা ভারতীর মতোই হত।

এই অসহায় দুখিনী মেয়েটাকে ভালবাসতে বড় ইচ্ছা করে। আমি জানি ওর সঙ্গে নিজেকে যত জড়াব ততই এ বাড়ি থেকে বেরুনো আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে। নিজের তৈরি ফাঁদে জড়িয়ে যেতে যেতে আমি ছটফট করি, রেগে যাই, তবু একটা করুণ বিষণ্ণ দুখিনী মেয়ের মুখে হাসি ফোটাবার আনন্দ সর্বক্ষণ আমাকে যেন ঘিরে থাকে।

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, এক রবিবার বিজন আমাকে শ্রীরামপুরে সুধীর সেনদের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে ছুটির দিনে কোন না কোন বন্ধুর বাড়ি নিয়ে যায়। এর মধ্যে আমরা পর পর দুই রবিবার নিখিল আর চিন্ময়ের বাড়ি ঘুরে এসেছি।

সকালের দিকেই ওদের বাড়ি চলে গেছি আমরা। সারাদিন হৈচৈ হুল্লোড় করে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেছে।

বিজনের বন্ধু আর তাদের স্ত্রীদের আমার খুব ভাল লেগেছে। আমি মেয়েটা যেমন ভীরু তেমনি লাজুক। সবসময় অদ্ভুত এক সঙ্কোচ আমার পায়ে পায়ে জড়িয়ে থাকে। খুব সহজে প্রাণ খুলে আমি কারো সঙ্গে মিশতে পারি না। কিন্তু বিজনের বন্ধুরা, বিশেষ করে বন্ধুপত্নীরা আমার সঙ্কোচ এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। তারা হাত বাড়িয়েই ছিল; আলাপ-পরিচয় হবার সঙ্গে সঙ্গে কাছে টেনে নিয়েছে।

বিজনের বন্ধুর স্ত্রীরা সবাই দারুণ হুল্লোড়বাজ মেয়ে। তার ওপর সবারই মুখ ভীষণ আলগা; কিছুই সেখানে আটকায় না। আমার থুতনিতে টোকা দিয়ে দিয়ে ওরা চোখ টিপে টিপে যে ধরনের ঠাট্টা করে আর বিজনের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে যা সব বলে তাতে আমার কান গরম হয়ে ওঠে।

বিজলীর সঙ্গে বিয়ের দিনই আলাপ হয়েছিল।

দু রবিবার আগে শ্রীরামপুরের সুধীর সেনদের বাড়ি গিয়েছিলাম। ওখানে তার স্ত্রী লতিকার সঙ্গে আলাপ হয়েছে।

পাতলা লম্বাটে গড়ন লতিকার; গায়ের রঙ খুব ফর্সা; ছোট্ট কপালের ওপর কোঁকড়া কোঁকড়া নিবিড় চুলের ঘের। ঘন পালকে-ঘেরা

বড় বড় চোখ। লতিকার চাউনিটা ভারি সুন্দর ; তার মধ্যে কেমন একটা ঘুমের ভাব যেন মাখানো।

দুই ছেলেমেয়ের মা লতিকা. কিন্তু পাতলা ছিপছিপে গড়নের জন্য তাকে অল্পবয়সী মেয়ের মতো দেখায়।

সুধীর সেন আমাদের আলাপ করিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে লতিকা আমাকে একটা নিরিবিলি ঘরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পলকহীন আমার দিকে তাকিয়ে ছিল।

আমার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল। জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কী দেখছেন ?'

আমার থুতনির তলায় তর্জনী রেখে লতিকা দেখছিলই ; উত্তর ছায় নি।

আবার বলেছিলাম, 'কী দেখছেন ?'

লতিকা বলেছিল, 'আপনাকে।' তার কণ্ঠস্বর মিষ্টি এবং সুরেলা। কিছুটা ঝঙ্কারময়।

লজ্জা পেয়ে গিয়েছিলাম। আমি তো জানি এই বয়সেও আমাকে খারাপ দেখায় না। রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটি কোনদিকে তাকাই না। তবু টের পাওয়া যায় অগুনতি চোখ আমার গায়ে বিঁধছে। কখনও কখনও মুখ তুললে দেখতে পাই চারধারের মানুষগুলোর চোখে মুখে যা আছে তার নাম মুগ্ধতা। একথা অন্যরকমভাবে আপনাদের আগেও আরেকবার বলেছি।

সে যাক। ভেবেছিলাম, লতিকাও বুঝি আমাকে দেখে মুগ্ধ। সে জন্য আমার মতো লাজুক মেয়ে তাকাতে পারছিল না। শরীরের সব রক্তকণা জমে আমার মুখটাকে লাল টকটকে করে তুলেছিল।

লতিকা আবার বলেছিল, 'আপনার মতো মেয়ে আগে আর কখনও দেখি নি ভাই।'

হঠাৎ আমার খটকা লেগেছিল, রূপ দেখে সে ঠিক মুগ্ধ হয় নি ; তার অপলক তাকিয়ে থাকার মধ্যে অন্য কিছু আছে। আমি মুখ তুলে খানিকটা বিমূঢ়ের মতো বলেছিলাম, 'ছাখেন নি !'

ডাইনে এবং বাঁয়ে আস্তে আস্তে মাথা দুলিয়ে লতিকা বলেছিল, 'না।'

হেসে হেসে এবার বলেছিলাম, 'আমি খুব সাধারণ মেয়ে। কলকাতা শহরের রাস্তায় আমার মতো মেয়ে হাজার হাজার ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

লতিকা মুখটা আমার কানের কাছে এনে বলেছিল, 'আপনি অসাধারণ।'

লতিকা কী বলতে চেয়েছে বুঝতে না পেরে চুপ করে ছিলাম।

লতিকা একটু ভেবে বলেছিল, 'আচ্ছা ভাই, বলতে পারেন কলকাতায় কত লোক আছে?'

হঠাৎ এই বিশাল শহরের লোকসংখ্যা জানবার কী প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল লতিকার, কে জানে। আন্দাজে বলেছিলাম, 'সত্তর আশি লাখ হবে।'

'তার মধ্যে মেয়ে কত হবে?'

এ রকম উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করে কী জানতে চায় লতিকা? অবাক হয়েছিলাম ঠিকই তবু বলেছিলাম, 'পঁচিশ তিরিশ লাখ হবে।'

লতিকা বলেছিল, 'এই পঁচিশ তিরিশ লাখের ভেতর আপনার মতো মেয়ে একটাও নেই।'

'আপনি কী বলছেন, বুঝতে পারছি না।'

'পারছেন না!'

'না।'

'বেশ বুঝিয়ে দিচ্ছি।' চোখের তারা নাচিয়ে ঠোঁট ছুঁচলো করে লতিকা বলেছিল, 'বিয়ের পর কুমারী মেয়ে সেজে আপনার মতো কেউ ঘুরে বেড়ায় না।'

এতক্ষণে লতিকার এলোমেলো প্রশ্নগুলোর মানে যেন পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। একটু চুপ করে থেকে বিষণ্ণ হেসে বলেছিলাম, 'তা যা বলেছেন। আমার কপালই ওইরকম।'

'কপালের দোষ দিয়ে বসে থাকলে চলবে না। বিয়ে যখন করে বসেছেন, বরের ঘর করতেই হবে।'

আমি হেসেছিলাম।

লতিকা আবার বলেছিল, 'কবে বিজন ঠাকুরপোর সঙ্গে সংসার পাতছেন বলুন—'

'দেখি।'

'দেখি টেখি না ; এভাবে আপনাদের দু-জনকে ছাড়া-ছাড়া হয়ে থাকতে দেব না। আর ক'টা দিন দেখব। তারপর—' বলতে বলতে থেমে গিয়েছিল লতিকা।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তারপর কী?'

'আমরাই একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে জোরজার করে দু-জনকে ঢুকিয়ে দেব। বিয়ের পর এরকম আলাদা থাকা ভাল না।' লতিকার গলা এবার বেশ গাঢ় শুনিয়েছিল।

লতিকার আন্তরিকতা আমার খুব ভাল লেগেছিল। আমার বাবা-মা আমার বিয়ের কথা, আমার ঘর-সংসারের কথা ভাবে না। অথচ বিজনের বন্ধু এবং তাদের স্ত্রীরা বিজন আর আমাকে সুখী দেখতে চায়, আমরা একসঙ্গে থেকে সংসার করছি, সেই দৃশ্য দেখে তৃপ্ত হতে চায়। লতিকার কথা শুনতে শুনতে আমার চোখে সেদিন জল এসে গিয়েছিল।

বিজনের বন্ধুর স্ত্রীরা সবাই খুব ভাল মেয়ে। লতিকার মতো নিখিলের বউ অরুণাকেও আমার খুব ভাল লেগেছে।

বিয়ের আট দশ বছরের ভেতর চার পাঁচটা ছেলেমেয়ে হওয়ার জন্যই বোধহয় অরুণার শরীরে আর কিছু নেই। তার ওপর ছেলেপুলে যাতে আর না হয় সেজন্য অপারেশন করিয়েছে। এ খবর বিয়ের দিনই আমি জেনেছিলাম।

অরুণার গায়ের রঙ কাগজের মতো সাদা ; রক্ত-টক্ত বলতে কিছু নেই। এক পলক দেখেই টের পাওয়া যায়, ওর সারা শরীরে এনিমিয়ার স্পষ্ট স্থায়ী ছাপ।

খুব জোরে হাসতে পারে না অরুণা, জোরে কথা বলতেও না। তার কণ্ঠস্বর ধীর, মৃদু এবং দুর্বল। লতিকার মতো অরুণাও বিজনের কাছে এসে থাকার জন্য আমাকে তাড়া দিয়েছে। বলেছে, 'আমরা ছেলেপুলে

স্বামী নিয়ে ঘর করব আর আপনি মুখ শুকনো করে ঘুরে বেড়াবেন তা হবে না ভাই।'

অরুণা আর লতিকাকে খুবই ভাল লেগেছে। তবে সব চাইতে মজা পেয়েছি চিন্ময়ের বউ মাধবীর সঙ্গে কথা বলে।

গায়ের রঙ লতিকাদের মতো অত ফর্সা না মাধবীর। কচি পাতার চিকণ আভার মতো একটা ভাব আছে তার শরীরে ; তাকালেই চোখ জুরিয়ে যায়। গোলগাল আদুরে মুখ ; বড় বড় উজ্জ্বল চোখ, প্রতিমার মতো থুতনির আদল, কোমর ছাপানো চুল, গলায় শাঁখের মতো তিনটে থাক। ছ'বছরের বিবাহিতা জীবন এখনও নিষ্ফলা ; ছেলেপুলে হয় নি। তাই বোধ হয় চেহারাটা ভারী হয়ে আসছে।

পুরনো ধরনের সাজগোজের দিকে দারুণ ঝোঁক মাধবীর। বয়েস তিরিশের বেশি হবে না, কিন্তু নক্‌শাপাড় ধবধবে তাঁতের শাড়ি গিন্নী-বান্নিদের ঢংএ পরে থাকে ; আঁচলে চাবির থোকা ; নরম গোল হাতে গোছা গোছা সোনার চুড়ি ; গলায় পাথর-বসানো হার, পাতলা নাকে রক্তের কুঁড়ির মতো নাকছাবি, কানে সাদা পাথরের দুল।

দারুণ পান খায় মেয়েটা ; পানের রসে ঠোঁট সব সময় টুকটুকে। দারুণ কথা বলতে পারে সে এবং দারুণ হাসতে।

বিজলী আগেই আভাস দিয়েছিল ; আলাপ হবার সঙ্গে সঙ্গেই টের পেলাম, মাধবীর মুখ ভীষণ আলগা।

আলাপ-টালাপ হবার পরই মাধবী একহাতে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'তুই না মাইরি একটা রাবিশ মেয়ে।'

'আপনি' না, 'তুমি' না, প্রথম পরিচয়েই কেউ যে দুম করে 'তুই' বলে বসতে পারে, এমন ধারণা আগে আমার ছিল না। হকচকিয়ে বলেছিলাম, 'আমি—আমি—আমি—'

একহাতে কোমর জড়ানোই ছিল, আরেক হাতে আমার গাল টিপে লাল করে দিতে দিতে মাধবী বলেছিস, 'বিয়ে করেছিস অথচ বিজন ঠাকুরপোর কাছে থাকিস না। বরের কাছে না শুয়ে রাত কাটাস কি করে?'

শুনতে শুনতে আমার কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে শুরু করেছিল।

মাধবী আবার বলেছিল, 'বরকে জড়িয়ে ধরতে না পারলে আমার কিন্তু ভাই ঘুমই আসে না।'

উত্তর দিই নি ; জড়ানো গলায় গোঙানির মতো শব্দ করেছিলাম।

মাধবী আবার বলেছিল, 'আমি আমার মা-বাবার একমাত্র মেয়ে। দারুণ আদুরে। দু-চারদিন পরপরই হয় মা নয় বাবা এসে আমাকে নিয়ে যায়। দু-একদিন থাকতেও হয় তাদের কাছে। বাপের বাড়িতে সেই দুটো-একটা দিন কি খারাপ যে লাগে ভাই ! আমি তখন কী করি জানিস ?'

মাধবীর কথা শুনে দারুণ লজ্জা লাগছিল ; আবার মজাও পাচ্ছিলাম খুব। বলেছিলাম, 'কী করেন ?'

'স্রেফ একটা গুলতাপ্পি ঝেড়ে মা-বাবার কাছ থেকে বরের কাছে চলে আসি।'

আমি ঠোঁট টিপে এবার হেসেছিলাম ; কোন মন্তব্য করি নি।

মাধবীও হেসেছিল, 'আসলে আমার ব্যাপারটা হল সেই বেড়ালটার মতো—'

'কোন্ বেড়ালটা ?'

'সেই যে রে, মাছের গন্ধ ছাড়া যে ভাত খায় না সেই বেড়ালটা—'

বেড়ালের তুলনাটা বুঝতে না পেরে মাধবীর দিকে তাকিয়েছিলাম।

মাধবী বলেছিল, 'ওই বেড়ালটার মতো আমারও ভাই বর না হলে একদিনও চলে না। আসলে আমরা মেয়েরা হলাম—' বলতে বলতে থেমে গিয়েছিল সে ; চোখের কোণে আমাকে দেখতে দেখতে আর নিচের ঠোঁটে দাঁত বসিয়ে নিঃশব্দে হাসতে শুরু করেছিল।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কী ?'

'একেকটা মাছ-খেকো বেড়াল। তাই বলছি—'

'কী বলছেন ?'

হঠাৎ কপট রাগে চোখ পাকিয়ে তর্জনী তুলে মাধবী শাসিয়েছিল, 'এই, আমি 'তুই' চালিয়ে যাচ্ছি। আর তুই 'আপনি' 'আজ্ঞে' করছিস।'

'আপনি-টাপনি' করে বললে খুব খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু। উই আর ফ্রেণ্ডস—সখি।'

এটুকু বুঝেছিলাম, আমি যদি 'তুই' নাও বলতে চাই, মাধবী ঘাড় ধরে আমাকে বলিয়ে ছাড়বে। হেসে বলেছিলাম, 'ঠিক আছে, 'তুই' করেই বলব।'

মাধবী চারদিক দেখে নিয়ে এবার বলেছিল, 'বিজন ঠাকুরপো আর তুই কবে সংসার পাতছিস?'

'ইচ্ছা-তো তাড়াতাড়িই করি। কিন্তু—'

'কী?'

'আমাদের দু-জনেরই কিছু দায়-দায়িত্ব আছে। সে সবের একটা ব্যবস্থা না করে—মানে—'

'বুঝেছি।' বলেই চুপ করে গিয়েছিল মাধবী। কিছুক্ষণ পর গম্ভীর গলায় আবার শুরু করেছিল, 'হ্যাঁ, চিন্ময়ের কাছে শুনেছি, তোদের দুজনের কাঁধেই অনেক বার্ডেন, তা হলেও চিরকাল তো এভাবে চলতে পারে না। যত শিগগির পারিস একটা ব্যবস্থা করে ফেল—'

খানিক আগে মাধবী যে সুরে কথা বলছিল এখন সেই সুর একেবারে বদলে গেছে। হালকা ফাজিল চপল মাধবী এখন আশ্চর্য গম্ভীর, সহানুভূতিময়। তাকে আমার খুব ভাল লাগছিল।

মাধবীর মধ্যে গম্ভীর ভাবটাই খুব কম। কয়েক মিনিট পরেই আবার সে তার ফুরফুরে হাল্কা স্বভাবে ফিরে এসেছিল। ঠোঁট কুঁচকে হাসতে হাসতে বলেছিল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'কী?'

'বিজন ঠাকুরপোর সঙ্গে একটা রাতও কাটাস নি?'

'ধ্যাৎ! অসভ্য—'

'বেশ অসভ্য! শুনেছিলাম বিজলী ওর ফ্ল্যাটে তোদের ফুলশয্যার ব্যবস্থা করেছিল—'

'হ্যাঁ।'

'তোরা নাকি ফুলশয্যা ফেলে পালিয়ে গিয়েছিলি?'

'কী করব? বাড়ীতে বলে আসি নি। সেই অবস্থায়—'

ছ আঙুলে আমার নাক ধরে নাড়তে নাড়তে মাধবী বলেছিল, 'এক ব্রহ্মচারী আর এক ব্রহ্মচারিণী! কেন যে তোরা বিয়ে করিস! সে যাক গে, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। বন্ধু হিসেবে তোকে একটা প্রস্তাব দিচ্ছি।'

জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কি প্রস্তাব?'

'আমার ফ্ল্যাটে ভাই অনেকগুলো ঘর। আমরা মোটে দুটো লোক; বেশির ভাগ ঘরই ফাঁকা পড়ে থাকে। বলছিলাম কি, যদ্দিন না আলাদা সংসার করছিস বিজন ঠাকুরপো আর তুই মাঝে মধ্যে এসে আমাদের এখানে রাত কাটিয়ে যাবি।' বলেই চোখ টিপেছিল।

আমার কানের লতি গরম হয়ে উঠেছিল। দ্রুত মুখ নামিয়ে বলেছিলাম, 'ধুৎ—'

আমার গালে টুসকি মেরে মাধবী এবার বলেছিল, 'ধুৎ কি রে ছুঁড়ি, বরের কাছে থাকবি তাতে লজ্জা কিসের?'

জড়ানো গলায় বলেছিলাম, 'মুখে কিছুই আটকায় না।'

আমার কথায় কান না দিয়ে হেসে হেসে গলে পড়তে পড়তে মাধবী বলে গিয়েছিল, 'বরের কাছে তো থাকতেই হবে। তার রিহার্সালটা আমার এখান থেকেই দিতে থাক না।'

এবার আমি চুপ। মুখ খুলতে আর সাহস হয় নি। যাই বলি না কেন, তার এমন একটা উত্তর মাধবী দেবে যে মুখ তুলে তাকাতেই পারব না। মাধবীটা যাচ্ছে-তাই।

প্রতি ছুটির দিনে আজকাল বিজনের কোন না কোন বন্ধুর বাড়ি নেমন্তন্ন থাকে। এ কথা আপনাদের আগেই বলেছি। বিয়ের পর এই নেমন্তন্ন পাওয়াটা হয়েছে নগদ লাভ।

এর মধ্যে এক রবিবার সবাই মিলে দারুণ হৈ-হুল্লোড় করে স্টিমার-পার্টি করা হল।

আগের থেকেই ঠিক ছিল, যে যার বাড়ি থেকে সোজা আউটরাম ঘাটে চলে যাবে। সবাই আসবার পর লঞ্চে ওঠা হবে।

ভোরবেলা তখনও ভাল করে রোদ ওঠে নি, চারদিক আবছামতো, আউটরাম ঘাটে এসে দেখি, বিজন আর তার বন্ধুবান্ধব, বন্ধুদের স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা এসে গেছে।

আমাকে দেখে সুধীর সেন চেঁচিয়ে উঠল, 'কি ম্যাডাম, আপনি এত লেট ? আমরা কখন থেকে আপনার পথ চেয়ে আছি।'

বললাম, 'বা রে, কতদূর থেকে আমাকে আসতে হল বলুন তো।'

'আমাদের চাইতে দূব নিশ্চয়ই না। আমবা আসছি সেই শ্রীরামপুর থেকে।'

একটা দুর্বল কৈফিয়ৎ খাড়া কববাব চেষ্টা করলাম, 'এত ভোরে ঠিকমতো বাস পাওয়া যায় না ; আধ ঘণ্টা পর পর সারভিস। বাস রাস্তায় এসে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম ; বাস পাওয়া গেলে কখন চলে আসতাম।'

সুধীর সেন আবার কি বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মেয়েদের জটলা থেকে মাধবী চেঁচিয়ে উঠেছিল 'ছুঁড়ি, সব ব্যাপারেই তোর লেট। বিয়ে কবতে লেট, ঘর-সংসাব করতে লেট। বাসে চড়ে এইটুকু আসতে লেট্ তো হবেই। নে—নে, আর দেরি করিস না। লঞ্চ রেডি ; চটপট উঠে পড়া যাক।'

সবাই হল্লা করে হেসে উঠল।

আউটরাম ঘাটের গা ঘেঁষে একটা মাঝারি লঞ্চ দাঁড়িয়ে ছিল। হাসতে হাসতে আমরা তাতে উঠলাম। একটু পর লঞ্চ ছেড়ে দিল।

তারপর সারাদিন শুধু খাওয়া-দাওয়া, হুল্লোড়। নিখিল একটা রেকর্ড প্লেয়ার এনেছিল ; আর রবীন্দ্র সঙ্গীতের লং-প্লেয়িং রেকর্ড। হুল্লোড়বাজির ফাঁকে ফাঁকে অনেক গান শোনা হল। সুধীর সেন জীবনানন্দ আর সুধীন দত্তের কবিতা আবৃত্তি করে শোনালে। নিখিল দেখাল তাসের ম্যাজিক। তারপর ছবি তোলা শুরু হয়। প্রথমে সবাই

মিলে গ্রুপ ফটো। তারপর সব বন্ধুদের একসঙ্গে দাঁড় করিয়ে একটা ফোটো তোলা হল। বন্ধুর স্ত্রীদেরও আলাদা আরেকটা ফোটো নেওয়া হল।

ফোটো তুলছিল নিখিল। গ্রুপ ফোটো তোলা হলে সে বলল, 'এবার ভাই যুগল মিলনের ছবি নেব। সুধীর তুই আর লতিকা পাশাপাশি দাঁড়া—'

আগেও কার মুখে যেন একবার যুগলমিলনের কথা শুনেছিলাম। এখন মনে পড়ল না।

একেক জন বন্ধু আর স্ত্রীকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে আলাদা আলাদা ছবি তুলল নিখিল। সবশেষে এল আমার আর বিজনের পালা।

আমি আর বিজন অন্য সবার মতো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিলাম। গম্ভীর চালে নিখিল বলল, 'উঁহু—উঁহু—'

বিজন ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'উঁহু কী?'

'তোদের এই রকম 'পোজ' চলবে না।'

'তবে কি রকম?'

'দেখাচ্ছি, দাঁড়া—' বলেই নিখিল করল কি, বন্ধুদের বাচ্চাগুলোকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে সাবেঙ-এর কেবিনের ওপাশে রেখে এল। ফিরে এসে বলল, 'বোস্ শালা—'

বিজন ঘাড় বাঁকিয়ে বিদ্রোহের ভঙ্গিতে বলল, 'বসব কেন, অ্যাঁ—বসব কেন? সব শালা দাঁড়িয়ে ফোটো তুলল, আমার বেলায় বসে কেন?'

'তুমি যে সবার থেকে আলাদা চাঁদ—'

'কেন, আলাদা কেন?'

খুব রগড়ের মুখ করে নিখিল বলল, 'তুমি যে দামড়া বয়েসে বিয়ে করেছ, সেই জন্যে। বোস্—।'

ভুরু কুঁচকে বিরক্ত মুখে বিজন বলল, 'বসে কী হবে?'

'বসে পড়ই না। তারপর কী হবে, দেখাচ্ছি।'

গুচ্ছের তেতো গিলবার মতো মুখ করে শেষ পর্যন্ত বসেই পড়ল বিজন।

নিখিল এবার আমার দিকে তাকাল, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করছেন কী ?'

হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, 'কী করব তা হলে ?'

হুড়মুড় করে বিজনের পাশে বসতে যাচ্ছিলাম. নিখিল দারুণ চেঁচামেচি জুড়ে দিল, 'উঁহু—উঁহু ওখানে না—'

'তবে কোথায় ?'

বিজনের কোলটা দেখিয়ে নিখিল বলল, 'এইখানে—নইলে যুগল-মিলন হবে কি করে ?'

বিজন এইসময় চেঁচিয়ে উঠল, 'শালা খচ্চর—' বলেই উঠে পড়তে চাইছিল, পারল না। আমিও আরক্ত মুখে ছুট লাগাতে যাচ্ছিলাম, পারলাম না। বিজনের বন্ধুরা ওকে চেপে ধরে বসিয়ে রাখল ; আর বন্ধুর বউরা জোর করে আমাকে বিজনের কোলে বসিয়ে দিল। এবং এরই ফাঁকে পটাপট অনেকগুলো ছবি তুলে ফেলল নিখিল।

বিজন রেগে উঠতে গিয়ে হেসে ফেলল, 'তোরা না মাইরি একেকটা ফার্স্ট ক্লাস হারামী—'

নিখিল বলল, 'তা যা বলেছিস ! ফোটোটা ডেভলাপ করে পাঠাই ; দেখবি শালা যুগল-মিলন কাকে বলে !'

বিজনের কোল থেকে ছাড়া পেয়ে আমি আর কারো দিকে তাকাতে পারলাম না। আমার মতো ভীরু দুর্বল লাজুক মেয়েটাকে নিয়ে ওরা কি কাণ্ডটাই না করল।

যাই হোক ভোরবেলা আমরা আউটরাম ঘাট থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম। গঙ্গার গেরুয়া জলে মাছের মতো সাঁতার কেটে আমাদের লঞ্চটা বিকেলবেলা ডায়মণ্ডহারবার পেরিয়ে চলে গিয়েছিল।

আমরা নদীর মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। সবে শরতের মাঝামাঝি। আকাশ যদিও উজ্জ্বল নীল ; এখানে-ওখানে পেঁজা তুলোর মতো ধবধবে ভবঘুরে মেঘ ; তবু এরই মধ্যে বাঙলাদেশের এদিকটায় হিম পড়তে শুরু করেছে। শরতের এই হিম গাঢ় বা ভারী ধরনের না ; পাতলা ফিনফিনে কুয়াশার মতো নদীর দু-ধারকে ঝাপসা করে রেখেছে।

এর মধ্যেই আকাশের ঢালু পাড় বেয়ে প্রকাণ্ড লাল বলের মতো

সূর্যটা গড়িয়ে গড়িয়ে অনেকখানি নেমে গেছে। রোদের রঙ এখন বাসি হলুদের মতো ; তার তাপও দ্রুত জুড়িয়ে আসছে।

কে যেন চেঁচিয়ে বলল, 'আর গিয়ে দরকার নেই ; এবার ফেরা যাক।'

অন্য সবাই বলল, 'হ্যাঁ, ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে যাবে। বাচ্চা-কাচ্চা রয়েছে। বেশি দেরি করলে ওদের কষ্ট হবে।'

লঞ্চের মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হল। সারাদিন পর এবার কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি।

সূর্যটা এতক্ষণ যেন সরু সুতোয় ঝুলছিল। সুতোটা কখন যে ছিঁড়ে গেল আর কখন যে সূর্যটা দিগন্তের ওপারে টুপ করে খসে পড়ল, মনে নেই।

জলে কালি গুলবার মতো আস্তে আস্তে চারদিক কালচে হয়ে আসতে লাগল। তারপর ঝপ করে কখন একসময় রাত নেমে এল।

আজ কি তিথি কে জানে। সন্ধ্যের কিছুক্ষণ পর চন্দনের পাটার মতো গোল একখানা চাঁদ জলের তলা থেকে উঠে এল যেন।

সারাদিন হৈ-চৈ হুল্লোড় করে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ডেকের ওপর সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে চুপচাপ বসে আছি। ঝির ঝির করে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। চাঁদ উঠবার পর নদীকে এখন আর চেনাই যাচ্ছে না। গেরুয়া জলের ধারাটি তরল রুপোর স্রোত হয়ে গেছে যেন।

নিখিল বলল, 'এখন কী হলে মন ভরে যায় বল্ তো—'

সুধীর সেন বলল, 'রবীন্দ্র সঙ্গীত—'

'রাইট। রেকর্ড প্লেয়ারটা বার কর—'

'উঁহু—'

'কী ?'

'রেকর্ডের গান তো সবসময় শুনছি। আমাদের মধ্যে কে গাইতে পারে বল—'

অরুণা বলল, 'একমাত্র মাধবী পারে।'

'ইয়েস মাধবী' ; মাধবী গাইবে—'

লক্ষ্য করেছি বিজনের বন্ধুরা একে অন্যের স্ত্রীকে 'তুমি' করে বলে।

নাম ধরেও ডাকে। আমার সঙ্গে মেলামেশা এবং ঘনিষ্ঠতা কম বলে খুব সম্ভব এখনও 'আপনি' 'টাপনি' চালাচ্ছে। তবে খুব বেশিদিন 'আপনি'র দূরত্বটা থাকবে না বলেই আমার ধারণা।

মাধবী খালি গলায় ক'টা গান গাইল। ভারি মিষ্টি আর ভরাট গলা তার। মেয়েটা এমনিতে দারুণ ফাজিল কিন্তু গানের ব্যাপারে ভীষণ সীরিয়াস। চারদিকে ধবধবে জ্যোৎস্না, ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে হাওয়া, রুপোর স্রোতের মতো নদী, মাথার ওপর আদিগন্ত খোলা শরতের আকাশ আর মাধবীর চমৎকার গলা—সব একাকার হয়ে প্রাণ যেন ভরে গেল।

একটানা সাত আটটা গান গেয়ে মাধবী থামল। বলল, 'আমি আর পারছি না ভাই।'

বিজলী বলল, 'আর দুটো—প্লীজ—'

'অনেকদিন অভ্যাস নেই। অতগুলো গাইলাম, এবার রেস্ট না দিলে গলা চিরে যাবে।'

'তার মানে এত সুন্দর সন্ধ্যেটাকে মার্ডার করে দিতে চাইছিস?'

'বা রে মার্ডার হবে কেন, আর কাউকে গাইতে বল্ না—'

'আর কি কেউ গাইতে জানে! আমি হাঁ করলে তো একসঙ্গে আঠারো রকমের আওয়াজ বেরোয়। আর লতিকা অরুণাও তো একেবারে গন্ধর্বলোক থেকে নেমে এসেছে—' বলতে বলতে বিজলী লতিকা আর অরুণার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল।

লতিকা অরুণা ঘাড় হেলিয়ে বলল, 'যা বলেছিস ভাই।'

বিজলী বলল, 'আর আমাদের মিস্টারদের মুখ থেকে যা বেরোয় তাকে আর যা-ই হোক গান নিশ্চয়ই বলা যায় না।'

সুধাময়-নিখিল-চিন্ময়রা কোরাসে চেঁচিয়ে উঠল, 'কী বেরোয় আমাদের মুখ দিয়ে, কী বেরোয়?'

'টেপ রেকর্ড করে রাখলে বুঝতে পারতে।'

মাধবী বলল, 'তোমাদের দৌড় জানা আছে। কিন্তু একজনকে টোকা দিয়ে দেখেছ?'

'কাকে ?'

মাধবী আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, 'ওকে। বকুল নিশ্চয়ই গান জানে।'

মাঝে মাঝে গলার ভেতর একটু আধটু যে গুনগুন না করি তা নয়। স্কুলে পড়বার সময় বন্ধুরা বলত, আমার গানের গলা নাকি খুব ভাল ; চর্চা করলে আমি নাম করতে পারব। তখন আমরা ভাল করে পেট পুরে খেতে পাই না, একই কাপড় রাত্রে ধুয়ে শুকিয়ে ঘটির পেছন দিক দিয়ে ইস্তিরি করে তবে পরের দিন বেরুতে হয়। সেই অবস্থায় বলে কিনা গান শিখে নাম করব !

আমি জোরে জোরে প্রবলবেগে হাত এবং মাথা নেড়ে বললাম, 'না—না, আমি গান-টান জানি না।'

মাধবী বলল, 'নিশ্চয়ই জানিস।'

'সত্যি বলছি, জানি না। মা কালীর দিব্যি।' আমি প্রায় ঘেমে উঠলাম।

অরুণা বলল, 'যা জানো তাতেই চলবে। তুমি তো আমাদের কাছে সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী হবার পরীক্ষা দিতে বসছ না।'

বিজনের বন্ধুরাও তাড়া লাগাল, 'যা জানা আছে তাতেই চলবে।'

আমার যেন কি হয়ে গেল। জ্যোৎস্না-ধোওয়া এই নদী, রুপোর থালার মতো গোল চাঁদ, চারধারে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে-বসে-থাকা বন্ধুরা—সব মিলিয়ে আমার মধ্যে কিছু একটা ঘটে থাকবে। নিজের অজান্তেই যেন গলায় গান তুলে নিলাম :

'ধরা সে যে দেয় নাই, দেয় নাই,
যারে আমি আপনারে সঁপিতে চাই।
কোথা সে যে আছে সংগোপনে…'

গানটা শেষ হবার পর সুধীর সেন খুব আন্তরিক গলায় বলল, 'গ্র্যাণ্ড !'

চিন্ময় বিজনের গায়ে আলতো ধাক্কা দিয়ে ডাকল, 'এই শালা বিজন—'

বিজন মুখ ফিরিয়ে তাকাল, 'কী বলছিস ?'

'তোর বউটা লজ্জাবতী লতা হলে কি হবে ভেতরে মাইরি খাসা ফোয়ারা আছে—রীয়েল ফাউণ্টেন—'

মাধবী আমার গানের কথাগুলো নিয়ে আচমকা মজার গলায় বলে উঠল, 'ধরা দেবে ধরা দেবে, নিশ্চয়ই সে ধরা দেবে। হাত বাড়িয়ে ছাখ না ছুঁড়ি—'

বিজন খুব লজ্জা পেয়ে গেল, 'কি যে বল না! থার্ড ক্লাস—'

বিজনের অন্য বন্ধুরা হুল্লোড় বাধিয়ে হেসে উঠল। আমি আর বসে থাকতে পারছিলাম না : উঠে সারেঙের কেবিনের ওধারে ছুট লাগালাম।

কলকাতায় ফিরতে ফিরতে রাত দশটা বাজল।

সেই ভোর থেকে এতটা সময়, প্রায় ষোল সতের ঘণ্টা স্বপ্নের মতো কেটে গেল।

মাঝখানে তিনচা'রদিন অফিসে আসে নি কনক।

এই অফিসে কনকই আমার সব চাইতে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। স্টেলা, অনীতা, মঞ্জু—সব মিলিয়ে টাইপ সেকসনে আমরা দশ বারোটা মেয়ে। সবার সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব, প্রীতির সম্পর্ক। কিন্তু কনকের সঙ্গে অন্তরঙ্গতাটা অন্য ধরনের। খুব সম্ভব বারো বছর আগে একই দিনে আমরা চাকরি করতে এসেছিলাম বলে।

একযুগ ধরে আমরা পাশাপাশি সীটে বসছি; টিফিনের সময় মুখোমুখি বসে ক্যানটিনে বা অন্য কোন রেস্তোরাঁয় চা-টা খেয়েছি; সুখ-দুঃখ কামনা-বাসনার কথা বলেছি। কনক দারুণ খোলামেলা মেয়ে; আমার কাছে গোপনীয়তা বলতে তার কিছুই নেই। আমিই বরং কনককে

আমার বিয়ের কথাটা জানাই নি।

আমার ঠিক ডান পাশের চেয়ারটায় কনক বসে। তিন দিন চেয়ারটা ফাঁকা পড়ে আছে। দারুণ বিশ্রী লাগছে আমার। কনকের সঙ্গে সারাদিনের কয়েক ঘণ্টা কাটাতে না পারলে, দু-চারটে প্রাণের কথা বলতে না পারলে আমার মন ভীষণ খাবাপ হয়ে যায়। একটানা বারো বছরের অভ্যাস তো।

এর আগে একসঙ্গে এতদিন কনক ছুটি নিয়েছে কিনা আমার মনে নেই।

যাই হোক, কালকেব দিনটাও দেখব। কালও যদি কনক অফিসে না আসে পরশু ছুটির পব দমদম চলে যাব। দমদমে গভর্ণমেণ্ট হাউসিং স্কীমেব একটা লো-ইনকাম-গ্রুপেব ফ্ল্যাটে ওবা থাকে।

দমদম পর্যন্ত আর ছুটতে হল না। পবেব দিনই কনক অফিসে এসে হাজির।

আমি বললাম, 'তুই তো আচ্ছা মেয়ে!'

কনক আদুবে গলায় বলল, 'কেন, কী কবেছি রে?'

'তিন দিন কোথাও ডুব দিয়েছিলি?'

'কোথায় আবার, বাড়িতেই ছিলাম।'

'অসুখ-টসুখ কবে নি তো?'

'আরে না—না।'

আমি বললাম, 'আজকের দিনটা দেখতাম। আজও যদি না আসতিস কাল তোদের বাড়ি চলে যেতাম।'

কনক আমার দিকে তাকিয়ে থাকল; কিছু বলল না।

আমি আবার বললাম, 'অসুখ করে নি বিসুখ করে নি, বাড়িতেও ছিলি, তবে অফিসে আসিস নি কেন?'

চোখের কোণ দিয়ে আমাকে দেখতে দেখতে ঠোঁট টিপে হাসতে লাগল কনক।

আমার চোখ কুঁচকে গেল, 'হাসছিস যে হতচ্ছাড়া মেয়ে!'

কনক আমার কানের ভেতর মুখ ঢুকিয়ে গভীর রহস্যময় গলায় বলল,

'রিহার্সাল দিচ্ছিলাম—'

এর আগে কে যেন আমাকে কী একটা ব্যাপারে রিহার্সাল দেবার কথা বলেছিল ; এক্ষুণি ঠিক মনে করতে পারলাম না। বললাম, 'কিসের রিহার্সাল ?'

'একেবারেই তো ছুটি নিতে হবে ; তার আগে একসঙ্গে তিন দিন নিয়ে দেখলাম কি রকম লাগে।'

আমার বুকের ভেতর দিয়ে ঢেউয়ের মতো কি খেলে গেল। চমকে উঠে বললাম, 'একেবারে ছুটি মানে !'

আলতো করে আমার গালে টুসকি মেরে কনক বলল, 'তোর কি কিছুই মনে থাকে না ?'

তক্ষুণি আমার মনে পড়ে গেল, এ মাসেই কনকের বিয়ে। বিয়ের পনের দিনের ভিতরেই সে লণ্ডন পাড়ি দিচ্ছে। আবছা গলায় বললাম, 'তার মানে—তার মানে—'

'তার মানে তাই—' কনক হাসতে লাগল। তারপর আঙুল ফোটাতে ফোটাতে আবার শুরু করল, 'এই তিনটে দিন সারা কলকাতা চরকির মতো ঘুরেছি ভাই। উঃ, হাড়গোড় একেবারে আলগা হয়ে গেছে !'

'কলকাতা চষবার কী হল !'

'বা রে, পরশুদিন বিয়ে না ?'

এ মাসেই বিয়ে জানতাম। ওরা ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে নোটিশও দিয়েছিল। কিন্তু তারিখটাকে দু-জনে যে এত কাছে এগিয়ে এনেছে তা জানা ছিল না।

হঠাৎ আমার মনে হল, এ ষড়যন্ত্র। আমাকে না জানিয়ে এভাবে এত তাড়াতাড়ি বিয়ের তারিখ ঠিক করে ফেলা উচিত হয় নি কনকের। রাগ দুঃখ ক্ষোভ—সব মিলিয়ে কনকের ওপর আমার মনোভাবটা আচমকা কি রকম যেন হয়ে গেল। একবারও মনে হল না, আমিও ওকে লুকিয়ে বিয়েটা সেরে ফেলেছি। ক্ষোভ আর রাগ—মানসিক অবস্থার দুই বিপরীত মেরুতে ধাক্কা খেতে খেতে আমি ঘাড় গোঁজ করে বসে থাকলাম।

কনক হয়তো আমাকে ভাল করে লক্ষ্য করে নি ; আপন মনে সে বলে যেতে লাগল, 'মাথার ওপর আমার আর কে আছে বল্। নিজের বিয়ের জন্য আমাকেই ছোটাছুটি খাটা-খাটনি সবই করতে হল। এ সময় যদি বাবা থাকত—' কনকের গলা শেষ দিকে ভারি হয়ে এল।

আমার ক্ষোভ-টোভ পলকে উধাও। মনে পড়ল, নিজের হাতে নিজেকে সাজিয়ে চোরের মতো আমাকেও একদিন বিয়ে করতে যেতে হয়েছিল। কনকের সঙ্গে আমার জীবনের কি আশ্চর্য মিল!

কনক আবার বলল, 'ডাইভোর্স-হওয়া মেয়ে হলেও তো এটা বিয়েই। একটা বিয়ের কেনাকাটা কি কম! ঘুরে ঘুরে আমাকেই সব করতে হয়েছে। অবশ্য—'

'কী?'

'তোর কথা খুব মনে পড়ছিল।'

'কেন রে?'

'ভেবেছিলাম এই তিনদিন তোকে ছুটি নিতে বলব। তারপর দু'জনে কেনাকাটা করতে বেরুব।'

'বললেই পারতিস—'

একটু চুপ করে থেকে লাজুক হাসল কনক, দাঁত দিয়ে আঙুল কামড়াল। একসময় বলল, 'বলব কি, তার আগেই অরুণ এসে হাজির—'

আমি রগড়ের গলায় বললাম, 'কি রকম, কি রকম? কিসের যেন গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।'

'আর বলিস না ভাই, এমন বিচ্ছিরি স্বভাব অরুণের, এক মিনিট আমাকে কাছছাড়া করতে চায় না।' কনক যা-ই বলুক, সুখ আর গর্বে তার মুখচোখে আলো খেলে যাচ্ছে। একটি পুরুষকে সম্পূর্ণ জয় করার সুখ এবং গর্ব।

আমি হেসে হেসে বললাম, 'বেশ তো। খুব ভালো, খুব ভালো—'

কনক আবার বলল, 'মার্কেটিং-এর সময় সারাক্ষণ অরুণ আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিল ; জিনিসপত্র পছন্দ করে দিয়ে আমাকে খুব হেল্প করেছে।

তাই আর তোকে ছুটি নেবার কথা বলিনি।'

'আসল লোকই তো সঙ্গে ছিল; আমাকে বলার আর দরকার কী?'

আমার কথা বোধহয় শুনতে পেল না কনক, নিজের মনে বলে যেতে লাগল, 'এই লোক এখন ছায়ার মতো আমার গায়ে লেপ্টে আছে, বিয়ের পর কি যে করবে!'

লক্ষ্য করলাম কনকের চোখে-মুখে, বলার ভঙ্গিতে এবং কণ্ঠস্বরে আগের সেই গর্ব, সেই সুখ। বললাম, 'যা করবে তা ভালোই লাগবে তোর।'

ভেংচি কাটার মতো করে কনক বলল, 'ভালোই লাগবে, তোকে বলেছে! ও আমার হাড় জ্বালিয়ে খাবে।'

আমি হাসতে লাগলাম।

একটু ভেবে কনক বলল, 'জানিস ভাই, একটা কাণ্ড হয়েছে।'

জিজ্ঞেস করলাম 'কী কাণ্ড রে?'

'আমি অরুণকে বলেছিলাম, রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করতে। প্রথম দিকে ও রাজীও ছিল, ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে আমরা নোটিশও দিয়েছিলাম—'

'এ তো জানিই।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তোকে বলেছিলাম। কিন্তু ভাই শেষ পর্যন্ত অরুণ আর ওর বাড়ির লোকেরা সব গোলমাল করে দিল—'

'কী গোলমাল?'

'বলল রেজিস্ট্রী-ফেজিস্ট্রী হবে না; একেবারে ছাঁদনাতলায় সাত পাক ঘুরতে হবে।'

পলকের জন্য আমার বিয়ের দৃশ্যটা চোখের সামনে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। অনুভব করলাম, দারুণ হিংসেয় আমার বুকের ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছে।

কনক থামে নি, সমানে বলে যাচ্ছে, 'একবার পুরুতের কাছে মন্তর পড়ে বিয়ে হয়েছিল। আবার কেমন করে যে ওভাবে বিয়ে করতে

যাব! এমন বিচ্ছিরি লাগছে না!'

সোজা কনকের চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, ও যা বলছে তার উল্টো খেলাটাই চলছে ওর মধ্যে। হাতে গাছকৌটো নিয়ে বিয়ের আসরে হাজার গণ্ডা লোকের ভিড়ে বরের সঙ্গে মালা-বদলের ইচ্ছে যোল আনার জায়গায় আঠারো আনা; অথচ মুখে শুধু না—না—না। লোভী সুখী বেড়ালের মতো মনে মনে ফুলে আছে মেয়েটা, কিন্তু কত ন্যাকামোই যে জানে! কনক, আমার সব চাইতে প্রিয় সখি, বারো বছর আমরা পাশাপাশি বসে টাইপ করেছি, কত সুখ-দুঃখের গল্প করেছি—এ সব কথা পলকে ভুলে গেলাম যেন। কনকের সঙ্গ হঠাৎ অসহ্য হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইলাম। প্রিয় বান্ধবীর সুখ এবং তৃপ্তি আমাকে যে এমন ঈর্ষান্বিত করে তুলতে পারে, কে ভাবতে পেরেছিল! পরক্ষণেই নিজের ওপর আমার দারুণ রাগ হল। এত নীচ আমি! পরের সুখে এত কাতর? নিজের নীচতা ক্ষুদ্রতা আমার বুকের ভেতর অনবরত ছুঁচ ফোটাতে লাগল।

কনক বলে যাচ্ছে, 'আমি অরুণকে এ সব ঝঞ্ঝাট করতে বারণ করেছিলাম। ও কিছুতেই শুনলে না; বললে তোমার আগের বিয়েটা বিয়ে না, এটাই আসল বিয়ে! আর বিয়ে যখন হচ্ছে তখন বিয়ের মতোই হোক। অরুণের ইচ্ছেকে বাধা দেবার শক্তি আমার নেই। ওর পাল্লায় পড়ে, বুঝলি বকুল, আমি একেবারে গোল্লায় গেছি।'

আমার মধ্যে রৌদ্রছায়ার মতো কনক সম্বন্ধে ঈর্ষা আর সহানুভূতির খেলা চলছিল। মাঝে মাঝে ঈর্ষাটাকে পোকার মতো গা থেকে ঝেড়ে ফেলছিলাম, তখনই কনকের প্রতি সুতীব্র ভালোবাসায় আমার মন পূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। খুব আন্তরিক গলায় বললাম, 'এমন গোল্লায় গিয়েও সুখ, না কি বলিস কনক?'

চোখের তারা কয়েক পলক স্থির রেখে হঠাৎ হেসে ফেলল কনক, 'তা যা বলেছিস ভাই।' একটু থেমে আবার বলল, 'ভেবেছিলাম, রেজিষ্ট্রী করে বিয়েটা হলে দু'তিন শো টাকায় সেরে ফেলব। তা না, প্যাণ্ডেল খাটাও, পুরুত ডাকো, শাঁখ বাজাও—অরুণের জন্যে চারটে

হাজার টাকা খরচ হয়ে যাবে। ব্যাঙ্কে যে ক'টা টাকা জমিয়েছিলাম সব শেষ।'

'ভালোই তো—'

'ভালো না হাতি! জানিস অরুণটা আরো কী কাণ্ড করেছে?'

'কী?'

'জোর করে আমার যত আত্মীয়-স্বজন সবাইকে নেমন্তন্ন করিয়েছে।'

কনকের প্রতিটি কথায় একবার করে 'অরুণ' এসে পড়ছে। প্রথমে আমার মনে হল, মেয়েটা কি দারুণ হ্যাংলা; বিয়ের নামে কেমন ডগমগ হয়ে উঠেছে। তারপরেই ভাবলাম, আহা ও সুখী হোক। আগের বিয়েটা ওর বড় দুঃখের; বড় গ্লানির। জীবনের এই অবেলায় পেঁৗছে অরুণের মতো একটা সরল চমৎকার ছেলেকে পেতে চলেছে; কনক তো একটু উচ্ছ্বসিত হবেই। সেটাই তো একান্ত স্বাভাবিক।

আচমকা কি মনে পড়ে যেতে কনক তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ও, ভালো কথা, তোর নেমন্তন্নের কার্ডটা দিচ্ছি—' বলেই একটু থেমে কি ভেবে নিল, 'আচ্ছা, এখন থাক। তোর বিজনচন্দ্র টিফিনে আসছে তো?'

'আসবার কথা আছে।'

তখন কার্ড দেব।

আমি চুপ করে থাকলাম।

টিফিনের সময় আর সব দিনের মতো আজও বিজন এসে হাজির। আমরা তিনজনে—বিজন, কনক আর আমি কাছাকাছি একটা রেস্টুরেন্টে চলে গেলাম।

কনক তার ব্যাগ থেকে নেমন্তন্নের চিঠি বার করে খামের ওপর গোটা গোটা অক্ষরে বিজন আর আমার নাম লিখল। কার্ডটা বিজনের হাতে দিয়ে বলল, 'পরশু বিয়ে; যুগলে যাবেন।'

বিজন এক পলক আমাকে দেখল। তার চাউনির মধ্যে যা ছিল, বুঝতে অসুবিধে হল না। অর্থাৎ হাঁদা মেয়ে—দেখ, ভালো করে নিজের বন্ধুকে দেখ। তারপর দ্রুত কনকের দিকে ফিরে বলল, 'কনগ্র্যাচুলেসনস—'

কনক গর্বিত সুখী মানুষের মতো হাসল ; 'পরশুদিন কিন্তু সকাল বেলাতেই আপনাদের আসা চাই।'

বিজন একটু চিন্তা করে বলল, 'বেলা ছুটোর আগে তো অফিস কাটতে পারব না। বকুল বরং আগে চলে যাবে—আমি অফিস থেকে যত তাড়াতাড়ি পারি যাব।'

'আচ্ছা—'

কনকের বিয়েটা দারুণ হৈ-চৈ হুল্লোড়ের মধ্যে কাটল। বিজন আর আমি আমার প্রিয় সখির বিয়েতে খুব খাটলাম।

সে রাতে আর বাড়ি ফেরা গেল না ; কনক কিছুতেই আসতে দিল না।

বিয়ে বাড়ির খাওয়া-দাওয়া চুকতে চুকতে একটা-দেড়টা বেজে গিয়েছিল। অত রাত্তিরে কোথায় ট্রাম, কোথায়ই বা বাস! ট্যাক্সি হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু আমার মতো একটা মেয়ের পক্ষে ওই সময় একা একা রাস্তায় বেরুনো কি সম্ভব! বিজনকে বললে নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করে সে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে। কিন্তু এত রাতে তাকে আর টানাটানি করতে ইচ্ছা করল না। বাকি রাতটুকু কনকের বাসরে জেগেই কাটিয়ে দিলাম।

আমি একাই না, কনকের বাসরে আমাদের অফিসের আরো ছু-তিনটে মেয়ে—স্টেলা, মঞ্জু, অতসীও থেকে গিয়েছিল।

এটা কনকের ছু নম্বর বিয়ে হলেও হৈ-হুল্লোড়-আনন্দ বেশ জমেছিল। মঞ্জু আর অতসী হারমোনিয়াম বাজিয়ে ক'টা মজাদার গান গাইল ; স্টেলা সেই গানের সঙ্গে কোমর বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে নাচল। জোর করে ওরা আমাকে দিয়েও ক'টা গান গাইয়ে ছাড়ল। তবে আমি রগড়ের গান, আমোদের গান তেমন জানি না। আমি গাইলাম রবীন্দ্রসঙ্গীত আর অতুলপ্রসাদের গান।

বিজনও অত রাত্তিরে বাড়ি ফিরতে পারে নি ; কনকদের বাড়িতে তাকেও থেকে যেতে হয়েছিল। প্যাণ্ডেলের তলায় তিন চারটে টেবল

জোড়া দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করেছিল সে কিন্তু দমদমের এদিকটায় এত মশা যে কার সাধ্য শুয়ে থাকে! বাকি রাতটা সিগারেট খেয়ে আর মাঝে মাঝে বাসরঘরে উঁকি দিয়ে কাটিয়ে দিতে হয়েছে তাকে।

কম করে আট দশ বার সে বাসরঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। লক্ষ্য করেছি যখনই বিজন এসেছে, পলকহীন স্থির ঝকঝকে চোখে কনকের দিকে তাকিয়ে থেকেছে; তারপর একপলক আমাকে দেখেই চুপচাপ ফিরে গেছে।

পরদিন ভোরবেলা, রোদ উঠবার আগেই বিজন আর আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম। কনক চা-টা খেয়ে যাবার জন্য বার বার করে বলল।

আমি বললাম, 'এখন আর আটকাস না ভাই। বাড়িতে না বলে সারা রাত কাটিয়ে গেলাম। সবাই নিশ্চয়ই খুব ভাবছে।'

'আহা, চা খেয়ে গেলে কি আর এমন দেরি হয়ে যেত!'

কনকের দু'হাত ধরে বললাম, 'প্লীজ, আজ আর না।'

কনক আর জোর করল না। বলল, 'বৌভাতের দিন আসছিস নিশ্চয়ই?'

'চেষ্টা করব।'

'চেষ্টা না, আসতেই হবে।'

ওদের বাড়ি থেকে বড় রাস্তা পর্যন্ত বিজন আর আমি নিঃশব্দে পাশাপাশি হেঁটে এলাম। বাস স্টপেজে এসে হঠাৎ বিজন বলল, 'তুমি কি এখন বাড়ি যাবে?'

বললাম, 'না হলে আর কোথায় যাব?'

'আজ অফিসে যাচ্ছ?'

'না। রাত জেগেছি; দুপুরবেলা খেয়ে-দেয়ে একটা ঘুম না লাগাতে পারলে নির্ঘাত মরে যাব। তুমি অফিস যাচ্ছ?'

'যেতেই হবে। জরুরি কাজ আছে। চলো ভবানীপুর পর্যন্ত একসঙ্গে যাই। এখন আর বাড়ি গিয়ে চান করে খেয়ে ঠিক সময় অফিসে আসতে পারব না। ভাবছি ভবানীপুরে নিখিলের বাড়ি চান-খাওয়াটা সেরে নোব।'

বলতে যাচ্ছিলাম, 'চল আমাদের বাড়ি—' তক্ষুণি কট করে জিভে কামড় পড়ল যেন। কোথায় নিয়ে যেতে চাইছি বিজনকে?

বিজন আমার স্বামী; অথচ তাকে একদিনও আমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে পারি নি। হঠাৎ আমার দুচোখ জলে ভরে আসতে লাগল।

বাস এসে গিয়েছিল। এত সকালে তেমন ভিড়-টিড় নেই। আমরা একটা সীটে বসলাম। আমি জানালার ধারে, বিজন আমার পাশে।

এই বাসটা সোজা এসপ্ল্যানেডে যায়; সেখান থেকে আবার বাস বদল করতে হবে।

কাছাকাছি বসে আছি ঠিকই কিন্তু গাড়িতে উঠবার পর কেউ একটা কথাও বলিনি।

বাসটা দমদমের রাস্তা থেকে যখন বি, টি, রোডে এসে পড়ল সেই সময় বললাম, 'কনকের বিয়েটা বেশ কাটল।'

বিজন অন্যমনস্কের মতো বলল, 'হুঁ—'

আমি আবার বললাম, 'দারুণ হৈ-চৈ আনন্দ হল—'

বিজন আগের মতোই বলল, 'হুঁ—'

'মেয়েটা এবার সুখী হবে।'

'হুঁ—'

আমি সমানে বকে যাচ্ছি আর বিজন একই রকম হুঁ-হুঁ করে যাচ্ছে। হঠাৎ আমার মনে হল, বিজন কিছু ভাবছে। তার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম। তারপর বললাম, 'কী হয়েছে তোমার, কী অত চিন্তা করছ?'

বিজন সোজা আমার চোখের দিকে তাকাল, 'একটা কথা ভেবে দারুণ মজা লাগছে!'

'কী কথা?'

'বলব?'

'না বলবার কী আছে—'

'একটা ব্যাপারে আমার খুব অদ্ভুত লাগছে।

'কোন্ ব্যাপারে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিজন বলল, 'কাল রাত্তিরটা কেমন চমৎকার কনকদের বাড়ি কাটিয়ে এলে!'

কিছু না ভেবেই উত্তর দিলাম, 'বা রে, খেতে খেতে অত রাত হয়ে গেল? তখন কি বাড়ি ফেরা যায়? তা ছাড়া কনকরা অত করে বললে।'

বিজন বলল, 'বন্ধুর বিয়ের সময় বেশ পারলে। অথচ নিজের বিয়েতে একটা রাত—মোটে একটা রাত বাইরে কাটিয়ে আসতে তোমার আপত্তি। বাড়ির কথা তুলে কত রকমের ভ্যানতাড়া। ফিরে না গেলে এ ভাববে, ও ভাববে, সে ভাববে। কাল কেউ ভাবে নি?"

বিজনের আক্রমণটা আচমকা এদিক থেকে এসে পড়বে, ভাবতে পারি নি। প্রথমটা দারুণ হকচকিয়ে গেলাম; কী উত্তর দেব ভেবে পেলাম না।

চাপা তীব্র গলায় বিজন বলতে লাগল, 'সুধাময়, সুধাময়ের বউ কত করে সেদিন বলল, আমি বললাম। কারো অনুরোধ রাখা তুমি প্রয়োজন মনে করলে না। আশ্চর্য!'

বাসের ভেতর ভিড়-টিড় তেমন না থাকলেও, ছড়িয়ে ছিটিয়ে আট দশজন বসে ছিল। কেউ কি বিজনের কথা শুনছে? দ্রুত চারপাশটা একবার দেখে নিলাম। তারপর বিজনের দিকে তাকালাম।

বিজনের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে, গলার কাছটা দারুণ কাঁপছে। তাকে খুব অস্থির আর উত্তেজিত দেখাচ্ছে।

আপনারা নিশ্চয়ই বলবেন এবং আমিও জানি, খুব সঠিক কারণেই বিজন আমার ওপর ক্ষুব্ধ হতে পারে, রাগ করতে পারে। কিন্তু আমার কথাটা আপনারা একবার ভেবে দেখুন।

করুণ মুখে আমি বিজনকে বললাম, 'তুমি রাগ করছ; কিন্তু কী করব বল—'

বিজন আমার কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'কাল তোমার বন্ধুর বিয়ে দেখতে দেখতে আমি একটা ডিসিসানে এসে গেছি।'

'কিসের ডিসিসান?'

'এখন বলব না।'

বিজনকে এবার গোঁয়ারের মত দেখাচ্ছিল ; আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না।

একসময় বাস এস্প্ল্যানেডে পৌঁছে গেল।

বিয়ের পর কনক চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। আমার পাশের সীটটা এখন ফাঁকা। নতুন কেউ না আসা পর্যন্ত ওটা ফাঁকাই পড়ে থাকবে।

কনকের শূন্য জায়গাটার দিকে তাকিয়ে সেই পুরনো হিংসেটা আমাকে পোড়াতে থাকে।

যাই হোক, চাকরি ছেড়ে দেবার পরও দু-চারবার অফিসে এসেছিল কনক। কিন্তু গেল সপ্তাহ থেকে আর আসছে না ; সে তার স্বামীর সঙ্গে লণ্ডন চলে গেছে।

এয়ার পোর্টে সী-অফ করবার জন্য কনক আমাকে আর বিজনকে যেতে বলেছিল। কিন্তু যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি।

কনকের বিয়েটা আমার কাছে দারুণ এক চমকের মতো। কোত্থেকে হুট করে ওর পিসতুতো বোনের দেওর এল, প্রেম করল, তারপর আকাশে উড়ে কোন্ লণ্ডনে উধাও হয়ে গেল।

আর আমি ? দশ বছর পর কোনরকমে বিয়েটা যদিও বা করতে পেরেছি, কিন্তু স্বামীর কাছে গিয়ে থাকতে পারছি না।

আয়নায় নিজের ছায়া দেখতে দেখতে একেক সময় আমি হেসে ফেলি। হাসি আর বলি, 'হা রে বকুল !'

কনকের বিয়ে হয়েছিল পুজোর কিছু আগে। দেখতে দেখতে পুজো এসে গেল। এল যেমন, তেমনি চলেও গেল।

পুজোর পর হঠাৎ পর পর চার দিন বিজনের দেখা নেই। বাইরে কোন এ্যাসাইনমেণ্ট না থাকলে বোজ আমাব অফিসে ওর আসাটা একটা নিয়মের মতো। যদি কোন কারণে না আসতে পারে, আগে থেকেই জানিয়ে ছ্যায়।

এবার কিন্তু কিছুই জানায় নি বিজন। হঠাৎ কি এমন হতে পারে যে পবপর চাবদিন খবর নেই? ও কি অসুস্থ হয়ে পড়ল?

বিজনের অফিসে খোঁজ নিয়েও কিছু বুঝতে পাবছি না। ওরাও কিছু জানে না। নিউজ ডিপার্টমেণ্টে ফোন করলে ওরা বলে, 'বিজন সান্যাল আসে নি।'

'ছুটি-টুটি নিয়েছে?'

'না।'

'কবে আসবে বলতে পারেন?'

'না।'

বিজনের বন্ধুদের ফোন করেও লাভ হল না; তাবাও কিছু বলতে পারল না। মাঝখান থেকে আমার দুশ্চিন্তাটা ওদেব কাঁধেও চাপল।

চারদিন একটা লোকের খবর নেই। আমি দারুণ ভাবনায় পড়ে গেলাম। মনে মনে স্থির করে ফেললাম, কাল আর অফিসে আসব না। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে সোজা বিজনদের বাড়ি চলে যাব।

কিন্তু যেতে আর হল না। চারদিন পব আজ অফিস ছুটির খানিকটা আগে হঠাৎ বিজনের ফোন এল।

চারদিন পর ওর গলা শুনতে পেয়ে আমার বুকের ভেতর' দিয়ে সিরসিরিয়ে স্রোতের মতো কি খেলে গেল। রাগও হল খুব। সেই সঙ্গে গাঢ় আবেগের মতো কিছু একটা আমাকে তোলপাড় করে ফেলতে লাগল। ফোনটা ধরে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলাম। বিজন সমানে চেঁচিয়ে যেতে লাগল, 'হ্যালো—হ্যালো—হ্যালো—'

একসময় রুদ্ধ গলায় বললাম, 'তুমি আশ্চর্য লোক—'

'কি রকম?'

'তুমি আমার কথা ভাবো?'

'তুমিই কি আমার কথা ভাবো ?'

বিজন কী বলতে চায়, বুঝেছি। অবুঝ বালিকার মতো জোরে-জোরে মাথা নেড়ে আমি বলতে লাগলাম, 'চার-চারদিন ডুব দিয়ে রইলে। খবর নেই, খোঁজ নেই। একটা লোক যে তোমার কথা চিন্তা করতে পারে তা একবার ভাবোও নি।'

'ভেবেছি বাবা, ভেবেছি।'

'ছাই ভেবেছ। এক নম্বরের দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষ তুমি।'

বিজন হাসতে লাগল, 'ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি এক নম্বরের দায়িত্বজ্ঞানহীন—'

রাগে আমার গা জ্বলে যেতে লাগল। বললাম, 'কোত্থেকে ফোন করছ ?'

'শ্যামবাজার পোস্ট অফিস থেকে।'

'আজ অফিসে এসেছিলে ?'

'না। একটানা পাঁচদিন ডুব দিলাম।'

'চাকরিটা থাকবে তো ?'

'বোধহয় থাকবে। আমার পুরো তিন মাস পি. এল. পাওনা আছে। যাক্‌গে, কাল তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে।'

ইচ্ছে করছিল, বিজন আজই চলে আসুক। মুখে বললাম, 'কোন প্রয়োজন নেই।'

'আছে কি নেই সে আমি বুঝব।'

আমি চুপ করে থাকলাম।

বিজন আবার বলল, 'কাল হাফ-ডে ছুটি ম্যানেজ করতে পারবে ?'

'কেন ?'

'খুব জরুরী দরকার আছে।'

'দরকারটা কী ?'

'অত জেরা কোরো না তো।'

'বেশ, করলাম না। কিন্তু টিফিনের আগে ছুটি নিতে পারব না ; হাতে অনেক কাজ জমে আছে।'

'টিফিনের পর নিলেই চলবে।'

'চেষ্টা করব।'

'চেষ্টা না ; নিতেই হবে। আমি কাল টিফিনের সময় আসছি। আচ্ছা এখন ছাড়ি।'

পরের দিন টিফিনের সময় বিজন এল। বলল, 'ছুটি নিয়েছ ?'

দারুণ গম্ভীর মুখে বললাম, 'নিয়েছি।'

ঘাড় কাত করে আমাকে দেখতে দেখতে রগড়ের গলায় বিজন বলল, 'ও ফাদার, মুখটাকে অমন হেড্‌মিষ্ট্রেসের মতো করে আছ কেন ?'

বিজনের বলার ধরনে হেসে ফেললাম, 'খুব হয়েছে। এখন বল হাফ-ডে ছুটি নিতে বলেছিলে কেন ?'

'চল্লিশ মিনিট পর বলব।'

'না, এখনই বল।'

'চল্লিশটা মিনিট ধৈর্য ধরতে পারবে না ? কি মেয়ে রে বাবা, এখন চল—'

'কোথায় ?'

'চলোই না—'

অফিস থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি ডাকল বিজন। আমি অবাক। বললাম 'কি ব্যাপার বল তো ?'

বিজন বলল, 'আগে ওঠ, পরে বলছি।'

বিজনের আজকের কথাবার্তা, আচরণ—সবই রহস্যপূর্ণ। আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম।

বিজন আবার তাড়া দিল, 'কি হল, উঠে পড়—'

প্রায় বিমূঢ়ের মতো ট্যাক্সিতে উঠলাম। বিজন ট্যাক্সিওলাকে বলল, 'ভি. আই. পি রোড চলুন—'

ট্যাক্সি নেতাজী সুভাষ রোডের বাঁক ঘুরে রাইটার্স বিল্ডিং-এর সামনে দিয়ে বউবাজার স্ট্রীটে এসে পড়ল।

আমার বিস্ময় কাটছিল না। বললাম, 'আমরা যাচ্ছি কোথায় ?'

বিজন বলল, 'ফিউ মিনিট্স্ ওনলি ; তারপর নিজের চোখেই সব দেখতে পাবে।'

বিজনের হেঁয়ালী ভাল লাগছিল না। বিরক্ত ঝাঁঝালো গলায় বললাম, 'কেন, এখন বললে কী ক্ষতি হবে ?'

'সারপ্রাইজটা নষ্ট হয়ে যাবে।'

আমি মুখ ভার করে জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকলাম। বিজন তার চোখেমুখে কৌতুক মেখে হেসে হেসে অনেক কথা বলতে লাগল। আমি কিন্তু তার দিকে তাকালামও না, একটা কথারও উত্তর দিলাম না।

আধঘন্টাও লাগল না, ভি-আই-পি রোডের পাশে গভর্ণমেণ্ট হাউসিং স্কীমের বাড়ীগুলোর কাছে আমরা পৌঁছে গেলাম। একই মাপের একই ধরনের সারি সারি অসংখ্য বাড়ি।

বাড়ীগুলোর একটা ফ্ল্যাটও খালি নেই বোধহয়। ট্যাক্সির আওয়াজ পেয়ে জানলায় জানলায় কৌতূহলী মুখ উঁকি দিতে লাগল।

বললাম, 'এখানে কী ?'

বিজন বলল, 'প্লীজ, আর এক মিনিট—'

ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া-টাড়া মিটিয়ে আমাকে নিয়ে সামনের একটা বাড়ীতে ঢুকে পড়ল। ওর সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় উঠলাম। উঠেই চোখে পড়ল, ডান ধারের ফ্ল্যাটটায় তালা ঝুলছে।

বিজন পকেট থেকে চাবি বার করে তালা খুলে ফেলল। তারপর আমাব দিকে ফিবে কুর্নিশের ভঙ্গিতে মাথা হেলিয়ে হাত-পা নেড়ে বলল, 'স্বাগতম—'

বিস্ময়টা ক্রমশঃ বেড়েই যাচ্ছিল। বিজনের সঙ্গে ভেতরে ঢুকলাম। বাড়িগুলো একেবারে আনকোরা। ঢুকতেই দেয়ালের গা থেকে হোয়াইট ওয়াসের এবং দরজা জানালা থেকে টাটকা পেইন্টের গন্ধ নাকে এসে লাগল। বললাম, 'এটা কাব ফ্ল্যাট ?'

বিজন বলল, 'আগে সবটা ভাল করে দেখে নাও, তারপর বলছি।'

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সমস্ত ফ্ল্যাটটা আমাকে দেখাল বিজন। মোট আড়াইখানা ঘর। দু'খানা বেশ বড়, একটা ছোট। তাছাড়া স্টোর

কিচেন, বাথরুম। বড় ঘর দুটো চমৎকার—দুটোই সাউথ ফেসিং।

ফ্ল্যাটটা একেবারে ফাঁকা; আসবাব-টাসবাব কোথাও কিছু নেই।

সব দেখানো হলে বিজন শুধলো, 'কেমন দেখলে?'

'খুব ভাল।'

'তোমার পছন্দ হয়েছে?'

'তার মানে?'

'মানে টানে ছাড়ো। পছন্দ হয়েছে কিনা তাই বলো।'

'যদি হয়ই তাতে কী?'

'তাহলে এই ফ্ল্যাটটা নেওয়া সার্থক।'

বললাম 'আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না। এই ফ্ল্যাটটা কার?'

আমার কাঁধে আলতো করে টোকা মেরে বিজন বলল, 'একেবারে হাঁদারাম! বলে না দিলে কিচ্ছু মাথায় ঢোকে না। আরে বাবা, ফ্ল্যাটটা তোমার আর আমার। সংসার-ফংসার করতে গেলে বাড়িঘর লাগে তো।'

আমার বুকের ভেতর স্রোতের মতো সিরসিরিয়ে কি খেলে যেতে লাগল। বললাম, 'ফ্ল্যাটটা কবে নিয়েছ?'

'কাল। তোমার বন্ধু কনকের বিয়ের দিনই মনে মনে ডিসাইড করেছিলাম, আর এভাবে চলে না। একটা ফ্ল্যাট নিতেই হবে। ফ্ল্যাট নিলে আমার কাছে আসার চাড় হবে তোমার।'

'আহা, তোমার কাছে আসার ইচ্ছে যেন আমার নেই!'

'দেখেশুনে তো তা-ই মনে হয়।'

ঘাড় বাঁকিয়ে বললাম, 'তোমায় বলেছে!'

একটু চুপ করে থেকে বিজন বলল, 'চারটে দিন ফ্লাটটার জন্যে পাগলের মতো ছোটাছুটি করেছি। কালই সবে পজেসান পেয়েছি।'

'এইজন্যেই বুঝি এ ক'দিন ছুটি নিয়েছিলে?'

'রাইট।'

'ফ্ল্যাট নেবে। কই, আমাকে আগে কিছু বলনি তো'?

'সারপ্রাইজ দেব বলে চেপে রেখেছিলাম।'

'আমার কাছেও সারপ্রাইজ।'

বিজন হাসতে লাগল। আর আমার বয়স যে তিরিশ তা একেবারেই ভুলে গেলাম। হঠাৎ কোন জাদুকর আমাকে যেন সুখী আদুরে অস্থির এক কিশোরী করে দিল। দৌড়ঝাঁপ করে একবার এ ঘরে যাই, একবার ও ঘরে। আর চেঁচিয়ে বলতে থাকি, এখানে খাট পাতব, ওখানে সোফা, সেখানে আলমারি। এই ঘরটা হবে আমাদের বেড রুম, ওইটা ড্রইং রুম। দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের ফোটো টাঙাবো, ও দেয়ালে সুন্দর দৃশ্যওলা একটা ক্যালেণ্ডার। তাকগুলোতে কবিতার বই সাজানো থাকবে। বাইরের ঘরের এককোণে এ্যাকুয়েরিয়ামে লাল-নীল মাছেরা খেলা করবে।

বিজন মাঝে মাঝে আপত্তি করছিল, 'না-না সোফাটা এভাবে না রেখে ওভাবে রাখলে, রবীন্দ্রনাথের ছবি এ দেয়ালে না টাঙিয়ে ও দেয়ালে টাঙালে দেখতে ভাল হবে।'

বিজন বাধা দিলেই কোমর বেঁধে চোখ পাকিয়ে ওর সঙ্গে কপট কলহে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছিলাম, 'চুপ করো তো। ঘর সাজানোর তুমি বোঝো কি? ওটা আমার ব্যাপার; সেখানে নাক গলাতে এসো না।'

মুখ কাচুমাচু করে বিজন বলছিল, 'ঠিক আছে বাবা আর একটা কথাও বলব না।' কিন্তু তারপরেই আবার ফোড়ন কেটে উঠছিল। আমিও রুখে দাঁড়াচ্ছিলাম। ঘর সাজানো নিয়ে আমাদের মধ্যে এক মজার খেলা চলছিল।..........

একসময় বিজন খুব রগড়ের গলায় বলল, 'চমৎকার!'

আমি ওর চোখের ভেতরে তাকিয়ে বললাম, 'কী হল?'

দুই হাত উল্টে দিয়ে বিজন বলল, 'খাট নেই আলমারি নেই, ড্রেসিং টেবল নেই, খালি হাতে আর কত ঘর সাজাবে।'

চোখ কুঁচকে বিজনের দিকে তাকালাম। তারপর হেসে ফেললাম।

বিজনও হাসতে লাগল।

দুপুরের একটু পর এই ফ্ল্যাটে এসেছিলাম। সারা বিকেল কাটিয়ে

সন্ধ্যের মুখে মুখে বেরিয়ে পড়লাম।

ট্যাক্সিতে ফিরতে ফিরতে বিজন বলল, 'মাথা গোঁজার একটা জায়গা পেয়ে গেছি। ওদিকে মা'রও একটা ব্যবস্থা হয়েছে। আশা করি এবার তুমি আমি একসঙ্গে থাকতে পারব।'

'মা'র কী ব্যবস্থা করলে?'

'তোমাকে মেণ্টাল হসপিটালের কথা বলেছিলাম না।'

মনে পড়ে গেল। বললাম, 'হ্যাঁ।'

বিজন বলতে লাগল, 'একটা হসপিটালে মা'র জন্যে সীট পেয়েছি। ওখানকার এ্যারেঞ্জমেণ্ট ভালই। পরশুদিন মাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

আচমকা আমার বুকে কাঁপন ধরল যেন। মায়ের ব্যবস্থা যখন করে ফেলেছে, তখন বিজনকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না; আমাকে তার কাছে নিয়ে যাবেই। একটু ভেবে বললাম, 'তোমার ভাগনের সেই চাকরিটা হয়ে গেছে?'

'এখনও হয় নি; তবে হয়ে যাবে।' একটু চুপ করে থেকে কি ভেবে বিজন আবার বলল, 'তোমার ফ্যামিলিতে যে জট-টটগুলো আছে, ছাড়িয়ে নাও। ভাগনের যেদিন চাকরি হবে, তার পরদিনই কিন্তু তোমাকে আমার কাছে চলে আসতে হবে।'

আস্তে করে বললাম, 'আচ্ছা।'

একসময় এস্‌প্ল্যানেডের কাছে আমাকে নামিয়ে দিয়ে বিজন চলে গেল। তারপর পাঁচ মিনিটও দাঁড়াতে হল না; শহরতলীর বাস আমাকে টুক্ করে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে ছুট লাগাল।

জানালার ধারের একটা সীটে বসেছিলাম। দু' পাশের বাড়িঘর, মানুষজন এবং অন্যান্য দৃশ্য পলক পড়তে না পড়তেই সট সট বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি সে-সব কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমার সামনে ভি. আই. পি. রোডের পাশে গভর্ণমেণ্ট হাউসিং স্কীমের সেই ফ্ল্যাটটা ছাড়া এখন আর কিছুই নেই। স্বপ্নের মতো সেটা আমার চোখে জড়িয়ে আছে।

অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে বাস থেকে নামলাম। কয়েক মিনিট পর বাড়িতে পা দিতেই প্রথমে দেখতে পেলাম নীলিমাকে, তারপর নির্মলকে। নীলিমা বারান্দায় বসে ভারতীর সঙ্গে গল্প করছে। আর নির্মল রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সৎ-মাকে কী বলছে। সৎ-মা রয়েছে রান্নাঘরের ভেতরে; নির্মল দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বলে তাকে দেখতে পাচ্ছি না।

ন'টার সময় যখন অফিসে বেরুই নীলিমারা ছিল না; আমি যাবার পর ওরা এসেছে। তার মানে এখন নির্মলের কোন কাজ নেই। বেকার হলেই বউ নিয়ে নির্মল এখানে চলে আসে।

ওদের এ বাড়িতে আসাটা এমন কিছু বিস্ময়ের ব্যাপার না; বেশির ভাগ মাসেরই অর্ধেক দিনই তো ওরা এখানে থেকে যায়।

চোখাচোখি হতেই নির্মল হাসল। আমিও হাসলাম, 'কখন এসেছ?'

নির্মল বলল, 'বিকেলে।'

উঠোন থেকে বারান্দায় উঠতে উঠতে বললাম, 'ভাল আছ তো?'

'আছি আর কি।'

'তোমাদের বাড়ির খবর ভাল?'

'ওই একরকম।'

উঠোন থেকে বারান্দায় উঠে এলাম। নীলিমা গল্প বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। ফাঁক পেতেই বলল, 'তোর ফিরতে এত দেরি হল দিদি?'

অফিস থেকে সাড়ে ছ'টা সাতটার ভেতর রোজই ফিরে আসি। ফ্ল্যাট দেখতে যাবার জন্য আজ ঘণ্টা দুয়েকের মতো দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু সে কথা তো আর বলা যায় না। যা বললাম তা এই, 'এসপ্ল্যানেডের ওদিকে কি গোলমাল হয়েছে; বাস পেতে দেরি হয়ে গেল। তাই—' বলেই ওদের পাশ দিয়ে আমার ঘরে চলে এলাম।

তারপর অফিসের জামাকাপড় ছেড়ে, হাতমুখ ধুয়ে সৎ-মা'র কাছে

থেকে এক কাপ চা নিয়ে আমার নিজের ঘরে এসে সবে বসেছি, নির্মল এল।

নির্মল ছেলেটা খুবই বিনয়ী, ভদ্র। ওকে আমার ভালই লাগে। বললাম, 'বোসো—'

একটু দূরে কুণ্ঠিতভাবে বসল নির্মল। তারপর আমার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল।

এক পলক ওকে দেখলাম। আস্তে করে চায়ে একটা চুমুক দিয়ে বললাম, 'কিছু বলবে?'

অস্পষ্ট গলায় নির্মল বলল, 'হ্যাঁ।'

'বল না—'

'আপনি যদি সাহস দ্যান—'

একটুক্ষণ থমকে রইলাম। তারপর বললাম. 'ঠিক আছে, তুমি বল—'

দু-এক মিনিট চুপ করে থাকল নির্মল; খুব সম্ভব বক্তব্যটা মনের মধ্যে গুছিয়ে নিল। তারপর কাচুমাচু করুণ মুখে যা বলল, সংক্ষেপে এই রকম। নির্মল যে ফ্যাক্টরিতে কাজ করত সেটা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। আগে তবু মাসে দিন পনের সে কাজ করত; এখন পুরোপুরি বেকার। কাজ নেই, তাই রোজগারও নেই। তার ফল হয়েছে এই, নির্মলের বাবা ছেলে এবং ছেলের বৌকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

নির্মল বলতে লাগল, 'এখানে এসে শ্বশুর-শাশুড়িকে সব বললাম। ওরা আপনাকে জানাতে বলল। যদ্দিন না আমার একটা কিছু হচ্ছে, আমাকে বাঁচান দিদি। আপনি ছাড়া আমাদের আর কোন ভরসা নেই।'

শুনতে শুনতে আমার মাথায় বন বন করে কয়েক চক্কর নাগরদোলা

যার যত দায়, যার যত সমস্যা যদি ক্রমাগত আমার ঘাড়ে চাপতে থাকে, কোনদিনই তো এ সংসার থেকে বেরুতে পারব না। হঠাৎ নির্মলের ওপর ভীষণ রাগ হয়ে গেল. কিন্তু তার ভীত অসহায় মুখের

দিকে তাকিয়ে কিছুই বলতে পারলাম না।

* *

রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর আমার ঘরের মেজেতে বিছানা পাততে পাততে চোখের কোণ দিয়ে আমাকে দেখতে লাগল গণেশ আর ঠোঁট টিপে টিপে অদ্ভুত হাসতে লাগল।

ভুরু বাঁকিয়ে বললাম, 'কী দেখছিস?'

গণেশ বলল, 'তোকে।'

'আমাকে দেখবার কী আছে? আগে কোনদিন দেখিস নি?'

'আগের দেখা আর আজকের দেখায় তফাত আছে।'

বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। তবে কি বিজনের সঙ্গে আমাকে কোথাও দেখেছে গণেশ! দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়াতে কামড়াতে একটু থতিয়ে থেকে বললাম, 'তফাত! তার মানে?'

গণেশ আগের মতোই হেসে যাচ্ছে।

ধমকের গলায় এবার বললাম, 'হাসছিস যে?'

আমার কথার উত্তর না দিয়ে গণেশ বলল, 'তোর মতো হ্যাপি মানুষ আমি দেখিনি দিদি।'

'কি রকম?'

'এই ছাখ না, আমরা তো তোর ঘাড়ে আগেই বিশ টন ওয়েট চাপিয়ে রেখেছি। তার ওপর বাচ্চুটা একটা ছুঁড়িকে এনে তুলল। তারপর আজ নীলি আর নির্মল এসে জুটেছে। ওরাও তোর ধর্মশালায় পার্মানেন্ট গেস্ট, বুঝলি?'

'নির্মলদের ব্যাপারটা তুই তাহলে শুনেছিস?'

'নিশ্চয়ই। সন্ধ্যাবেলা একবার বাড়ীতে এসেছিলাম; তখনই সব শুনে গেছি। তখন থেকেই ভাবছি, দিদিটার সুখের সাগরে একেবারে বান ডেকে যাবে। সত্যি দিদি, তোর মতো অবস্থা হলে আমি কী করতাম জানিস?'

অন্যমনস্কের মতো বললাম, 'কী?'

'কবে সটকে পড়তাম। আর নইলে—'

'নইলে কী?'

'গলায় দড়ি লাগিয়ে ঝুলে পড়তাম।'

আমার একদিকে বাবা, সৎ-মা, তিন ভাই, নীলিমা, নির্মল, ভারতী— অর্থাৎ একগাদা মানুষের দায়। আরেক দিকে বিজন এবং গভর্ণমেন্ট হাউসিং স্কীমের ছিমছাম নিরিবিলি এই ফ্ল্যাটে নিজস্ব একটি সংসার। দুই বিরুদ্ধ পক্ষ আমাকে দুই বিপরীত দিকে টানাটানি করে চলেছে।

আজকাল যতক্ষণ বাড়ীতে থাকি, সব সময়ই আমি ক্রুদ্ধ, বিরক্ত, অসন্তুষ্ট। মনে হয় বাড়িসুদ্ধু এতগুলো লোক চক্রান্ত করে আমাকে আটকে রেখেছে। এরা অত্যন্ত নীচ, ইতর, স্বার্থপর। আমার ভালো-মানুষির সুযোগ নিয়ে ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা আদায় করে নিচ্ছে। আমার কথা এরা ভাবে না। আমার সুখ-সাধ, সখ-আহ্লাদ এদের জন্য সেই কবে থেকে বিসর্জন দিয়ে বসে আছি।

শুধু দাও, দাও আর দাও। চুষে চুষে আমার সবটুকু রক্ত বার না করে এরা ছাড়বে না। আমি চলে যাব, চলেই যাব। এদের সাজানো নিপুণ ফাঁদ কেটে নিশ্চয়ই পালাব। ওরা কিছুতেই আর আমাকে আটকে রাখতে পারবে না।

কিন্তু যখনই প্রতিজ্ঞা করি চলে যাব, সেই প্রতিজ্ঞাটার পাশাপাশি ছায়ার মতো আরেকটা কথা মনে পড়ে যায়। আমি গেলে এদের কী হবে? কে দেখবে এতগুলো লোককে? তখন আমি ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ি।

ওদের কথাই আমি শুধু ভেবে মরি; ওরা কিন্তু আমার কথা ভাবে না।

যাই হোক আজকাল প্রায় সারাদিনই গভর্ণমেন্ট হাউসিং স্কীমের সেই ছোট ছিমছাম ফ্ল্যাটটা আমাকে তুরন্ত আকর্ষণে টানতে থাকে।

আপনাদের কাছে কত কথাই বলেছি। আরো একটা কথাও বলি। আজকাল টিফিনের সময় কোন কোন দিন বিজনের সঙ্গে সেই ফ্ল্যাটটায় চলে যাই। ছুটির দিনগুলোতে কথাই নেই; দু'জনে ওখানে কাটিয়ে দিই। যাই সকালে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায়। বিজন টিফিন ক্যাবিয়ারে করে হোটেল থেকে ভাত-মাংস কিনে আনে। গল্প করে করে দারুণ রঙচঙে ভবিষ্যতের একখানা ছবি আঁকতে আঁকতে দু'জনে এক পাতে বসে খাই।

দুটো যুবক-যুবতী প্রায়ই এই ফ্ল্যাটে আসে; ব্যাপারটা চারপাশের মানুষের কাছে সন্দেহজনক বৈ কি! আপনারা জানেন, যদিও আমরা স্বামী-স্ত্রী, আমি কিন্তু সিঁদুর-টিঁদুর পরি না। কেন পরি না, তা-ও আপনাদের অজানা নেই।

হাউসিং স্কীমের অন্য সব ফ্ল্যাটের ভাড়াটেরা যাতে সন্দেহ না করে সে জন্য একটা চাতুরির আশ্রয় নিতে হয়েছে। এখানে এলে ট্যাক্সিতেই আসি; আমার ব্যাগে একটা সিঁদুরের কৌটো থাকে। ট্যাক্সিতে বসেই টুক করে কপালে এবং সিঁথিতে সিঁদুর পরে নিই। যখন গাড়ি থেকে নামি, কে বলবে বিজন আর আমি আলাদা আলাদা থাকি; ওর বউ হয়ে কতকাল ধরে যেন ঘর-সংসার করে আসছি। এখান থেকে চলে যাবার আগে বিজন আবার ট্যাক্সি ডেকে আনে। আসবার সময় সিঁদুর লাগাই, ফেরার সময় উল্টো দৃশ্য। এবার সিঁদুর তোলার পালা। পরবার সময় আমার বুকের ভেতরটা খুশিতে ফুটন্ত দুধের মতো উথলায় কিন্তু সেই সিঁদুর মুছবার সময় মনটা এত খারাপ হয়ে যায়! আপনারাই বলুন, হাজার হোক, আমি একটা মেয়ে তো।

এক আধদিন এই নিয়ে দারুণ অস্বস্তিতে পড়ে যাই। ট্যাক্সির ড্রাইভারদের কেউ কেউ লক্ষ্য করে তাদের গাড়িতে যখন উঠেছিলাম তখন আমি কুমারী মেয়ে; কিন্তু নামবার সময় বউ হয়ে গেছি। কিংবা ফ্লাট থেক্কে বেরিয়ে যে বউটি তাদের গাড়িতে উঠেছিল, নামবার সময়,

কি আশ্চর্য, সে-ই কুমারী মেয়ে হয়ে গেছে।

ড্রাইভারেরা এই সময় অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। আমি কিন্তু তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারি না; দ্রুত চোখ নামিয়ে সামনে থেকে ছুটে পালাই।

এই ফ্ল্যাটে নিয়মিত যাতায়াতের ফলে আশেপাশের অনেকের সঙ্গেই আলাপ-টালাপ হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে আছে এক বুড়ি; তাকে মাসিমা বলি। আরেকজন হচ্ছে একটি বউ; আমারই সমবয়সী; ছেলেপুলে নেই দারুণ হাসিখুশি; থাকে আমাদের উল্টোদিকের ফ্ল্যাটটায়। আর মাসি থাকে আমাদের পাশের ব্লকের একতলার ফ্ল্যাটে।

আমরা এলেই বুড়ি গুট গুট করে আমাদের তেতলার ফ্ল্যাটে চলে আসে। আমরা এখানে এসে থাকব, ঘর-সংসার পাতব, বুড়ি তাই নিজের হাতে একটা উনুন তৈরি করে দিয়েছে। এত সুন্দর উনুন আমি খুব কমই দেখেছি।

দেখা হলেই বুড়ি বলে, 'কবে আসছ তোমরা?'

অর্ধেক সত্যি অর্ধেক মিথ্যে মিশিয়ে আমি একই উত্তর দিয়ে যাই, 'তাড়াতাড়িই তো আসবার ইচ্ছে। কিন্তু—'

'কী?'

'অনেক কেনাকাটা করতে হবে। সংসারের কোন জিনিসই এখন পর্যন্ত কেনা হয় নি।'

'আরে বাপু, সব আগে কিনে কি কেউ সংসার পাততে পারে?' একবার এসে ওঠ, দেখবে একটা দুটো করে সব কেনা হয়ে গেছে।'

আস্তে করে বলি, 'তা ঠিক। তবু—'

বুড়ি নিজের মনেই বলে যায়, 'কী নিয়ে তোমার মেসোমশাই আর আমি সংসার পেতেছিলাম জানো?'

'কী?'

'একটা তোলা উনুন, কলাই-করা দুটো থালা, একটা সিলভারের হাঁড়ি, দুটো গেলাস, একটা বালতি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ রে মেয়ে, হ্যাঁ। তারপর হয় নি কী? কোন্ জিনিসটা কেনা বাকি থেকেছে? পাঁজা-পাঁজা কাঁসার বাসন, কাপ-প্লেট, খাট-পালং—' বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে যায় বুড়ি।

উল্টোদিকের বউটাও আমাদের দেখলে ছুটে আসে। তারও একই কথা, 'কবে আসছেন ভাই?'

বউটির নাম শুভা; বেশ নাম। শুভাকে আমার খুব ভাল লাগে; আমাকেও তার নিশ্চয়ই ভাল লেগেছে। তার কাছে বিজন এবং আমার কথা অনেকখানিই বলে ফেলেছি। শুভাকে বলি, 'আমাদের কথা সবই তো জানেন। সব দিক গুছিয়ে গাছিয়ে আসতে হবে তো।'

'কবে গুছনো হবে?'

'দেখি—'

'দেখি বললে হবে না। শিগগির চলে আসুন। আপনি এলে যা আড্ডা দেব না?'

আমি হাসি, 'বেশ তো।'

শুভা কলকল করে অনেক কথা বলে যায়। আমি এলে আড্ডা দেওয়া ছাড়া আর কী কী করবে তার একটা লম্বা তালিকা শোনাতে থাকে।

একদিন ফ্ল্যাটে এসে বিজন বলল, 'আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে বকুল।'

আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম, 'কী?'

বিজন বলতে লাগল, 'আমাদের তো এখানে এসে থাকতেই হবে। তার আগে ফ্ল্যাটটা সাজিয়ে ফেলি; মুখে মুখে না; সত্যি সত্যি জিনিস পত্র দিয়ে। তুমি কি বল?'

তক্ষুণি সায় দিলাম।

বিজন বলল, 'অফিসে কিছু টাকা এরীয়ার পড়ে আছে, আসছে সপ্তাহে পেয়ে যাবো মনে হচ্ছে। পেলেই একটা খাট কিনে ফেলব।' তারপর একটু ভেবে আবার বলল, 'রেডিমেড কিনব, না অর্ডার দিয়ে তৈরি করাব?'

'অর্ডার দিলেই ভাল হয়। তাতে পছন্দ মতো করিয়ে নেওয়া যাবে।'

'ঠিক বলেছ।'

বিজন যা টাকা পেল তাতে একটা খাট ছাড়াও চমৎকার এক সেট সোফা হয়ে গেল। ও সোফা-খাট কিনেছে, আমি প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে লোন তুলে কিনলাম আলমারি আর ড্রেসিং টেবিল। বাদ বাকি জিনিস ধারে নিয়ে এলাম; মাসে মাসে দু'জনে মাইনের টাকা কিছু কিছু বাঁচিয়ে শোধ করে দেব।

পাখির মতো খড় কুটো জড়ো করে করে কিছুদিনের মধ্যে দু'জনে ফ্ল্যাটটা সাজিয়ে ফেললাম।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখে বিজন বলল, 'গৃহসজ্জা হল। মাকেও মেণ্টাল হসপিটালে পাঠিয়ে দিয়েছি। ভাগনের চাকরিটা হয়ে গেলেই কিন্তু তোমাকে চলে আসতে হবে।'

এই সুসজ্জিত নিরিবিলি ফ্ল্যাটটা আমার অস্তিত্বের ভেতর উথাল পাতাল। গাঢ় আবেগের গলায় বললাম, 'আসব, আসব, নিশ্চয়ই আসব। আসবার জন্যে পা বাড়িয়েই তো আছি।'

এক পলক তাকিয়ে থাকল বিজন; তারপর হাত বাড়িয়ে আমাকে তার বুকের ভেতর টেনে নিয়ে হাজার হাজার চুমু খেয়ে চলল।

একদিন সকালবেলা দারুণ চেঁচামেচিতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে বাইরে এসে দেখি উঠোনের এককোণে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভারতী; বাবা বারান্দায় বসে; আর সৎ-মা ভারতীর দিকে একটা আঙুল বাড়িয়ে উত্তেজিত হিংস্র ভঙ্গিতে হাত-পা ছুঁড়ে

সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'লজ্জাও করে না ; গলায় দড়ি দে মাগী, গলায় দড়ি দে।'

সৎ-মাকে কোনদিন ভারতীকে গালাগাল দিতে দেখি নি ; সর্বক্ষণ সে শুধু বিষাক্ত কুটিল চোখে তাকিয়ে থাকত।

অবাক হয়ে বললাম, 'কী হয়েছে ? মেয়েটাকে শুধু শুধু বকছ কেন ?'

'শুধু শুধু ?' সৎ-মা এবার আরক্ত চোখে আমার দিকে তাকাল।

থতিয়ে গিয়ে বললাম, 'তবে ?'

সৎ-মায়ের আঙুল ভারতীর দিকে বাড়োনোই ছিল। বলল, 'মাগীকে ছাখ, কি কাণ্ড করে বসে আছে !'

ভারতীর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম, তার চোখের কোল বসে গেছে, সেখানে গাঢ় কালি। গাল ভেঙে হনুর হাড় ঠেলে উঠেছে! হাতের নীল শিরাগুলো দড়ির মতো পাকিয়ে পাকিয়ে চামড়ার তলা থেকে বেরিয়ে পড়েছে। পেটটা অনেকখানি স্ফীত। ভারতীর সারা গায়ে মা হবার লক্ষণ। গভর্ণমেণ্ট হাউসিং স্কীমের সেই ফ্ল্যাট আর তার সাজসজ্জা নিয়ে মাঝখানে এত মেতে ছিলাম যে ভাবতীর এই পরিবর্তন লক্ষ করিনি।

সৎ-মা আবার চিৎকার করে উঠল, 'খচ্চর বদমাইস মাগী'।

বাবা এতক্ষণ পলকহীন জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে ছিল ; এবার একরোখা ক্রুদ্ধ জন্তুর মতো উঠে দাঁড়াল, 'একখান পয়সা কামানের নাম নাই, তাগো আবার পোলার শখ—'

সৎ-মা আর বাবার চিৎকারে গণেশ, হাবু, নির্মল এবং নীলিমা আশপাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। বাচ্চুর সাড়াশব্দ নেই ; খুব সম্ভব সে বেরিয়ে গেছে।

বাবা চেঁচিয়েই যাচ্ছিল, 'অমুন শখের মুখে আমি এই করি সেই করি।'

চারপাশের এতগুলো চোখের সামনে ভারতী কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে যাচ্ছিল। তাকে বাজে-পোড়া একটা মানুষের মতো দেখাচ্ছিল। ধমক দিয়ে বললাম, 'কী করছ এখানে দাঁড়িয়ে ? যাও—ঘরে যাও—'

মেয়েটা বেঁচে গেল যেন। কিংবা এতক্ষণ সে হয়তো অচেতন জড়স্তূপ হয়ে গিয়েছিল। এবার এক দৌড়ে দক্ষিণের ঘরটায় গিয়ে ঢুকল।

অফিস যাবার আগে পর্যন্ত বাবা আর সৎ-মায়ের গজগজানি শুনতে লাগলাম। তারপর বাকি দিনটা কি বিশ্রী যে কাটল!

বিজন ভেবেছিল, ওর ভাগনের চাকরিটা তাড়াতাড়িই হয়ে যাবে। কিন্তু হতে হতে সাত আট মাস লেগে গেল।

এত দেরি হচ্ছে বলে মাঝখানে ভীষণ হতাশ হয়ে পড়েছিল বিজন। প্রায়ই বলত, 'ভাগনেটার চাকরিও হবে না; তুমি আমি একসঙ্গে থাকতেও পারব না। ফ্ল্যাট সাজানোই সার।'

আমি বলতাম, 'এত ভেঙে পড়ছ কেন? নিশ্চয়ই চাকরি হবে।'

'তুমি বলছ, আমি কিন্তু আর ভরসা পাচ্ছি না।'

যাই হোক চাকরি হবার পর ছুটতে ছুটতে একদিন বিজন আমার অফিসে এসে হাজির। খুশিতে চোখমুখ জ্বলছে। প্রায় চেঁচিয়েই সে বলল, 'সব চাইতে বড় সমস্যাটার সমাধান হয়ে গেল। আসছে উইকে দিদিদের আলাদা বাড়ি ঠিক করে দিচ্ছি। ওরা চলে গেলেই তোমাকে আমার কাছে নিয়ে যাব। মনে রেখো, নেক্সট উইক—' বিজনকে এত উচ্ছ্বসিত হতে আগে আর দেখিনি।

কয়েক দিনের মধ্যে বিজনের কাছে চলে যাব; আমার প্রাণে সুখের বান ডাকার কথা। কিন্তু তখনই পর পর বাবা, সৎ-মা, ভারতী, নির্মল, বাচ্চু-হাবু-গণেশ আর নীলিমার মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠল।

দ্বিধান্বিতের মতো বললাম, 'আচ্ছা—'

পরের সপ্তাহে কিন্তু বিজনের কাছে যাওয়া হল না। যেদিন যাবার কথা, তার আগের দিন বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে এল। চিরদিনই লো প্রেসার বাবার ; সেটাই খুব একটা খারাপ দিকে বাঁক নিয়েছে। এখন বেশ কিছুদিন তাকে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হবে। তার ওপর যা দরকার তা হল দামী দামী ওষুধ আর ভালো ভালো পুষ্টিকর খাদ্য।

'বিজনকে বাবার কথা জানিয়ে বললাম, 'এ অবস্থায় কি করে যাই ?' বিজন ক্ষেপে উঠল, 'সব ব্যবস্থা করে ফেললাম ; দিদিদের আলাদা বাড়ি ভাড়া করে দিয়েছি। এখন বলছ যাবে কি করে ? এর কোন মানে হয় !'

'কী করব বল ?'

'তোমার বাবা আর অসুস্থ হবার সময় পেলে না ?'

বিজনের ছেলেমানুষিতে হেসে ফেললাম, 'অসুখ-বিসুখ হওয়া কি মানুষের হাতে !'

বিজন অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। আমার কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বাবার সুস্থ হতে কতদিন লাগবে ?'

রোগটা সহজে সারবার নয়। ডাক্তার বলেছে কম করে তিনটে মাস বাবাকে বিছানায় পড়ে থাকতে হবে। কিন্তু সে কথা বিজনকে জানাতে সাহস হল না। ভয়ে ভয়ে বললাম, 'শিগগিরই ভাল হয়ে যাবে।'

একটু চুপ করে থেকে বিজন বলল, 'আর দু' সপ্তাহ তোমাকে সময় দিচ্ছি তারপর কিন্তু কোন কথা শুনব না।'

'আচ্ছা—'

বিজন দু' সপ্তাহ সময় দিয়েছিল। কিন্তু চারটে দিনও কাটল না, পূর্ব বাঙলায় স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। পশ্চিম পাকিস্তানের দখলদার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল সাধারণ নিরস্ত্র মানুষের ওপর। শুরু হয়ে গেল হত্যা, লুটপাট, ধর্ষণ। গ্রামের পর গ্রাম পুড়ে শ্মশান হয়ে

যেতে লাগল। আর তারই ওপর দিয়ে লক্ষ লক্ষ ভীত অসহায় শরণার্থী সাতপুরুষের ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে আসতে লাগল সীমান্তের এপারে—পশ্চিম বাঙলায়।

বিজন রোজই আসে। কিন্তু একদিন টিফিনের সময় সে এল না; ফোনে জানাল, 'আজ যেতে পারছি না।'

'কেন?'

'এক্ষুণি বর্ডারে যেতে হচ্ছে। রিফিউজি আসছে জানো তো?'

'হ্যাঁ; খবর কাগজে রোজই দেখছি।'

'অফিস থেকে আমাকে 'কভার' করতে পাঠাচ্ছে।'

'কবে ফিরবে?'

'কিছু ঠিক নেই। তবে পাঁচ সাত দিনের আগে নিশ্চয়ই না।'

বিজন সেই যে গেল, তারপর ক'দিন আর খোঁজ নেই। তবে ও যে কাগজে কাজ করে তাতে ওর পাঠানো ছবি আর খবর রোজই দেখি। ছবি আর খবরগুলো যে ওরই তা বুঝতে পারি, কেননা তলায় লেখা থাকে—'সীমান্ত থেকে স্টাফ রিপোর্টার বিজন সান্যাল পাঠিয়েছেন'।

যাই হোক আট দশ দিন পর বিজন বর্ডার থেকে ফিরল; ফিরেই এল আমার অফিসে। তার চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। চুল উস্কখুস্ক, কণ্ঠার হাড় পেরেকের মত ফুটে বেরিয়েছে। মুখময় কয়েকদিনের দাড়ি, চোখদুটো যেন রক্তের ডেলা। দেখেই টের পাওয়া যায়, বেশ কয়েক দিন ওর চান খাওয়া ঘুম-টুম হয় নি। বললাম, 'শরীরের একি হাল করেছ!'

আমার কথার উত্তর না দিয়ে বিজন বলল, 'দারুন বিপদে পড়ে গেছি বকুল—'

তার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে চমকে উঠলাম। 'কি হয়েছে?'

'বর্ডারে ঘুরতে ঘুরতে একটা রিফিউজি ক্যাম্পে হঠাৎ দেখি বড় জ্যাঠামশাই আর তার ফ্যামিলি রয়েছে। পার্টিসানের পর জ্যাঠামশায় এপারে আসে নি; ওপারেই থেকে গিয়েছিল। সেই এল—আগেই যদি চলে আসত! সে যাগ গে, আমাকে দেখে তো বুড়ো হাউমাউ

করে কেঁদে উঠল ; বলল, এই ক্যাম্পে থাকতে পারবে না। কি আর করি সবাইকে ওখান থেকে বাড়িতে নিয়ে এসেছি।'

আমি তাকিয়ে থাকলাম।

বিজন বলতে লাগল, 'ভেবেছিলাম, তোমাকে এর মধ্যে আমার কাছে নিয়ে যাব কিন্তু তা আর হল না। এখন যেমন চলছে, চলুক। জ্যাঠামশায়দের একটা ব্যবস্থা করে তারপর না হয়—'

আমি বিষণ্ণ হাসলাম।

একটু চুপ করে থাকল বিজন। তারপর ক্লান্ত হতাশ গলায় বলল, 'কী ব্যবস্থাই বা করব! যা দিনকাল, কিছু করা সম্ভব না। সারা জীবনই হয়তো ওরা আমার ঘাড়ে বসে থাকবে।' একটু থেমে আবার বলল, 'তুমি আমি বোধহয় কোনদিনই একসঙ্গে থাকতে পারব না।'

কী বলব, ভেবে পেলাম না।

কিছুক্ষণ পরে বিজন চলে গেল।

আমার মতো মেয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে একটা বিয়ে হয়তো করতে পারে, অফিস থেকে লোন-টোন তুলে মনের মতো করে ফ্ল্যাটও সাজাতে পারে ছুটিছাটায় সেই ফ্যাটে গিয়ে সংসার-সংসার খেলতেও পারে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। স্বামীর কাছে গিয়ে থাকা আমার কোনদিনই হবে না ; সে পথে হাজার কাঁটা। বাচ্চু-হাবু-ভারতী-সৎ-মা-বাবা-নীলিমা-নির্মল সব মিলিয়ে যে মরণফাঁদ, তার বাইরে পালাবার উপায় নেই।

আমার বয়স এখন একত্রিশ। তার মানে জীবনের অর্ধেকটা তো কাটিয়েই ফেলেছি। বাকি দিনগুলোও এইভাবেই কেটে যাবে। আপনারা কী বলেন?

———